সম্পাদনা প্রেমেন্দ্র মিত্র

নোবেল জয়ী

মণি মাণিক্য

প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত

নোবেলজয়ী মণিমানিক্য

অনুবাদ

হান্নান আহসান

প্রণব সেন

গীতাঞ্জলি প্রকাশনী

৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,

কলিকাতা—৭৩

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ১৯৮৬

প্রকাশক
শুভাশীষ বল
গীতাঞ্জলি প্রকাশনী
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলিকাতা—৭৩

পরিবেশক
শৈব্যা পুস্তকালয়
৮/১ সি,শ্যামচারণ দে স্ট্রিট
কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ
অমিয় ভট্টাচার্য

অলংকরণ
অচিন্ত্য বিশ্বাস

দাম
পনের টাকা

মুদ্রক
শ্রীমতী বাণী ঘোষ
রেনবো প্রিন্টার্স
১এ, কার্তিক বোস লেন,
কলিকাতা-৬

A Collection of Short Stories of Nobel Laureates
Translated by Hannan Ahsan & Pranab Sen. Rs. 15/-

সূচীপত্র

প্রণব সেনের অন্য বই

ছদ্মবেশী
টুবলুর মন

হান্‌নান আহসানের অন্য বই

স্পোর্টস কুইজ

আনাতোলি ফ্রাঁস



প্যারিস শহরে ১৮৪৪ সালের ১৬ এপ্রিল আনাতোলি ফ্রাঁসের জন্ম। তাঁর আসল নাম জাকে আনাতোলি থিবো। পিতার ছিল একটি বিরাট বই-য়ের দোকান। ছোটবেলায় আনাতোলি বাবার দোকানে বসে বসে সেখানে আগত কবি-সাহিত্যিকদের বহু মূল্যবান আলোচনা শুনতেন। এভাবেই তাঁর মনে সাহিত্যের বীজ অংকুরিত হয়। প্রথম বয়সে প্রচুর কবিতা লিখতেন। পরে নাটক লিখলেও উপন্যাস রচনায় তিনি পুরোপুরি সাফল্য লাভ করেন। ১৯২১ সালে তাঁকে নোবেল পুরষ্কারে সম্মানিত করা হয়। 'The Crime of Sylvestre Bonnard, তাঁর প্রথম উপন্যাস। অন্যান্য বইয়ের মধ্যে 'Thais, The Life of Joan of Arc' এবং 'Penguin Island সমধিক উল্লেখযোগ্য। ১৯২৪ সালের ১২ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়।

রুডিয়ার্ড কিপলিং



ভারতবর্ষের বোম্বাই শহরে ১৮৬৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর রুডিয়ার্ড কিপলিং জন্ম গ্রহন করেন। পিতা ছিলেন একজন প্রখ্যাত শিল্পী। লাহোরে মিউজিয়াম-কিউরেটার হিসেবে রুডিয়ার্ড ভারত সরকারের অধীনে কিছুকাল কাজ করেন। হিন্দুস্থানী ভাষা শিখেছিলেন। এলাহাবাদের 'পাইওনীয়ার' পত্রিকায় তিন বছর সহযোগী সম্পাদক ছিলেন তিনি। সেই সময় প্রচুর কবিতা এবং ছোটগল্প লেখেন। তাঁর সাহিত্যে

ভারতবর্ষের পটভূমি বেশি লক্ষ্য করা গেলেও দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, মিশর, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি বহু দেশের নিখুঁত ছবি তিনি এঁকেছেন। 'The Jungle Book', 'The Second Jungle Book' গ্রন্থে ভারতবর্ষের আরণ্যক জীবনের বর্ণোজ্জ্বল রূপ বিধৃত হয়েছে। এই মহান সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯০৭ সালে।

লুইজি পিরান্দেলো



১৮৬৭ সালের ২৮ জুন সিসিলীতে পিরান্দেলোর জন্ম। ইতালিয়ান সাহিত্যে তিনি বিশেষ পারদর্শিতার ছাপ রাখতে সমর্থ হন। এক সময় রোম থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত তিনি রোম নগরীতে ইতালিয়ান সাহিত্যের অধ্যাপক রূপে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেন। নাটকের প্রতি তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। 'The Late Mattia Pascal' তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। ১৯৩৪ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কারের সম্মানে ভূষিত করা হয়। রোমে পিরান্দেলোর মৃত্যু হয় ১৯৩৬ সালের ১০ ডিসেম্বর।

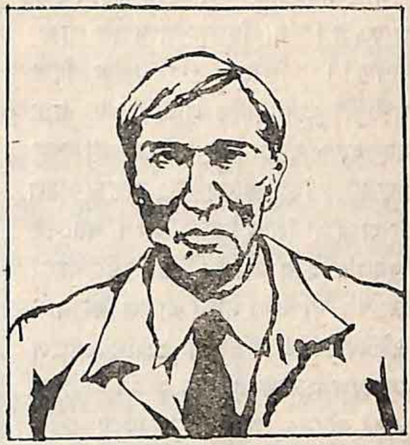
টমাস মান



জার্মান কথা সাহিত্যিক টমাস মানের জন্ম ১৮৭৫ সালে। তিনি একাধিক উপন্যাস লিখেছেন। উপন্যাস ছাড়াও ছোট গল্প এবং প্রবন্ধ রচনায় তাঁর মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসাবলীর মধ্যে 'দ্য ম্যাজিক মাউনটেন,' 'ডেথ ইন ভেনিস,' ডক্টর ফাষ্টাস', 'দ্য ব্ল্যাক সোয়ান,' 'জোসেফ এন্ড হিজ ব্রাদার্স' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হিটলারের রাজত্বকালে মান জার্মান থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন। তিনি সুইজারল্যান্ড এবং পরে

আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৯২৯ সালে এই বিখ্যাত লেখককে নোবেল প্রাইজ প্রদান করা হয়। মৃত্যুবরণ করেন ১৯৫৫ সালে।

বরিস পাস্টারনাক



১৮৯০ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী মস্কো শহরে বরিস পাস্টারনাকের জন্ম। বাবা ছিলেন চিত্র শিল্পী। মা ছিলেন পিয়ানো বাদিকা। ছোট বেলা থেকেই বরিস শিল্প সাহিত্যের পরিবেশে মানুষ হয়ে ওঠেন। স্কুলের গণ্ডি ডিঙিয়ে বরিস মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়ার জন্য ভর্তি হন। তারপর জার্মানে যান দর্শনশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করতে। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম কাব্যগ্রন্থ। মাত্র ১২টি মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন তিনি। এর মধ্যে একটিমাত্র উপন্যাসটি হল 'ডক্টর জিভাগো'। ১৯৫৮ সালে এই বইটির জন্য তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

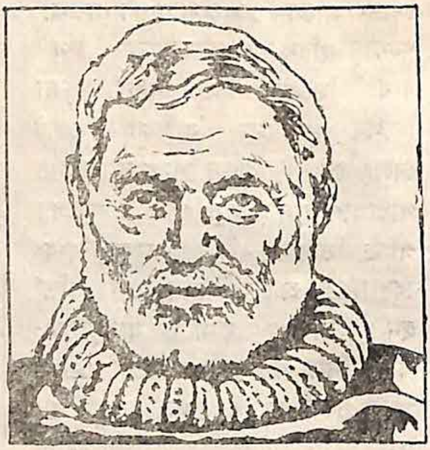
পার্ল বাক



শ্রীমতি পার্ল বাকের জন্ম ১৮৯২ সালের ২৬ জুন ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার এক অঞ্চলে। পিতা ছিলেন যাজক। খুব ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে পার্ল চীনদেশে চলে আসেন। সেখানেই তাঁর ছাত্রজীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। প্রথম প্রথম তিনি বাড়িতে মায়ের কাছে শিক্ষালাভ শুরু করেন। নানকিন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার অধ্যাপিকা হিসেবে যুক্ত ছিলেন। ডাঃ জন লসিং বাকের সঙ্গে বিয়ের পরও শ্রীমতী বাক বহুকাল চীনে কাটিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Good Earth' বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্ব এক নিঃশ্বাসে তাঁকে চিনে নেয়। বইটি একাধিক পুরস্কার বয়ে নিয়ে আসে। ১৯৩৮ সালে এই বইটির জন্য তিনি অনন্য সম্মান নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

আর্নেষ্ট হেমিংওয়ে

হেমিংওয়ের পুরো নাম আর্নেস্ট মিলার হেমিংওয়ে। জন্ম ১৮৯৮ সালের ২১ জুলাই। পিতা ছিলেন শিকাগো শহরের একজন নামী ডাক্তার।



খেলাধুলার প্রতি ছিল তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ। মা ছিলেন সংগীতে পারদর্শিনী। কিন্তু তাঁর ঝোঁক ছিল সম্পূর্ণ অন্য দিকে সাহিত্যে। মাত্র ২২ বছর বয়সে হেমিংওয়ে হ্যাডলে রিচার্ডকে বিয়ে করেন। 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' লিখে তিনি অল্প বয়সেই বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। ৫৪ বছর বয়সে লেখেন 'দ্য ওল্ড ম্যান এ্যান্ড দ্য সি' এই বইটি লিখে তিনি ১৯৫৪ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া একই বইয়ের জন্য আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সাহিত পুরস্কারগুলি উপহার লাভ করেন। ১৯৬১ সালের ২ জুলাই তাঁর মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬১ সালে কোলকাতার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাতা প্রভাবতী দেবী। খুব ছোটবেলা থেকে



কবিতা ছড়া, গল্প প্রভৃতি লিখতে শুরু করেন। স্কুলের বাঁধা ধরা গন্ডী তাঁর ভাল লাগতো না। অল্প বয়সে বাংলা সাহিত্যে প্রচুর নাম করেন। বলা বাহুল্য তাঁর হাতেই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। শুধু বাংলা নয়, সমগ্র ভারতবাসীর গর্ব তিনি। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, গান, নাটক, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি পারদর্শিতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। খুব ভাল ছবি আঁকতে পারতেন তিনি। বীরভূমের বোলপুরে তিনি শান্তিনিকেতন স্থাপন করেন। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার কমিটি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক পুরস্কারটি তাঁর হাতে তুলে দেন গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য। ১৯৪১ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

যাদুকর

আনাতোলি ফ্রাঁস

রাজা লুইয়ের রাজত্বকালে এক গরীব যাত্নকর ছিল। নাম তার বারনাবাস। এক শহর থেকে আরেক শহরে ঘুরে বেড়াতো ভেলকীর খেলা দেখিয়ে। কত মজার সে সব খেলা। দর্শক জুটতো প্রচুর। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতো মানুষজন তার আশ্চর্য্য খেলা। মেলার দিনে বারনাবাসের কপাল ফিরতো। চৌমাথার মোড় ছিল তার ধরা জায়গা। এইখানেই একটা ছেঁড়া ফুটিকাটা কার্পেট পেতে তার ভেলকীর খেলা আরম্ভ হতো। বারনাবাসের একটা অদ্ভুত কায়দা ছিল, প্রথমে কতরকম মজার মজার কথা বলে লোক জমাতো— এইসব লোকজনের মধ্যে থাকতো বেশিরভাগ বাচ্চা আর নিষ্কর্মার দল। একসময় দর্শক যখন উপছে পড়তো, সে শুরু করতো তার কৌশলপূর্ণ খেলা। অবশ্য প্রথমে কিভাবে লোক জড়ো করতে হয়, সে সব কায়দা কিংবা কথাবার্তা সে শিখেছিলো এক বুড়ো ভেলকিবাজের কাছ থেকে।

নাকের ওপর একটা প্লেট ব্যালান্সের খেলা দেখায় বারনাবাস। এইসময় তার দাঁড়ানোর ভঙ্গীটাও দেখার মতো। কিন্তু শুরুতে এই খেলাটা দর্শকদের মন নাড়া দেয় না। তারা আরো কিছু প্রত্যাশা করে চতুর যাত্নকরের কাছে। তাদের প্রত্যাশা পূরণ করতে বারনাবাস দেখায় অদ্ভুত আর কঠিন কঠিন খেলা। মাথা নিচের দিকে নিয়ে, হাতের ওপর শরীরের ভর রেখে ঠ্যাঙ ত্নটো শূন্যে তুলে ধরে চলে তামার বলের খেলা। পা দিয়ে যখন এই তামার বলগুলো লোফালুফি করে বারনাবাস, রোদে চিক্‌চিক্ করে বলগুলো। ভেলকী দেখিয়ে চলে যাত্নকর। এবার শরীরটা একটা চাকার মতো করে ফেলে অর্থাৎ ঘাড় এবং পা ত্নটো এক স্থানে নিয়ে এসে চলে

তার ছুরির খেলা। বারোটা ছুরি নিয়ে তার সেই অবিশ্বাস্য ভেলকী দেখতে দেখতে দর্শকরা আনন্দে অভিভূত হয়ে যায়। প্রশংসা করে তাকে। সঙ্গে সঙ্গে খুচরো পয়সা ছুঁড়ে দেয় তার ফুটিফাটা কার্পেটের ওপর। একসঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে যখন খুচরো পয়সাগুলো ধেয়ে এসে কার্পেটের ওপর পড়ে, বারনাবাসের মুখটা দীপ্তিতে ঝলমল করে ওঠে। মনে মনে যীশুমাতা মেরীকে স্মরণ করে।

কিন্তু এত পয়সা ছেঁড়া কার্পেটের উপর এসে পড়লেও বারনাবাসের সুখ আসেনি কোনদিনও। একটা সাধারণ খেটে খাওয়া দরিদ্র মানুষের মতো সে দিনযাপন করে। বহু কষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাকে রুটির জোগাড় করতে হয়। খাবারের অন্বেষণে একসময় প্রায় পাগল হয়ে ওঠে যাদুকর। মনে হয় একটা দরিদ্র অসহায় মানুষ যতটা কষ্ট ভোগ করে, তার চেয়ে একটু বেশি পরিমাণে যন্ত্রনা সহ্য করতে হয় বারনাবাসকে।

জীবিকা নির্বাহ করতে না পেরে তার এই যে কষ্ট, এর পিছনে কারণও রয়েছে যথেষ্ট। সময় সময় ইচ্ছেমত খেলা দেখাতে পারেনা সে। বিশেষ করে তার ঐ অদ্ভুত খেলাগুলোর জন্য প্রয়োজন হয় রোদের তাপ। অর্থাৎ একমাত্র গ্রীষ্মকালেই তার যা কিছু রোজগার। শীত এলেই তার আর কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকে না। শীত এসে পড়লে রাস্তায় রাস্তায় বরফ জমে যায়। গাছের পাতা ঝরে যায়। সামগ্রীকভাবে মনে হয়, শীত আসার সঙ্গে সঙ্গে জীবনে ছন্দ নষ্ট হয়ে যায়। বারনাবাসের সময়ও ভীষণ খারাপ যায় এইসময়ে। বরফ জমা রাস্তার ওপর খেলা দেখাতে না পেরে তাকে উপোসী থাকতে হয়। কিছুতেই দুটো রুটির জোগাড় সে করতে পারে না। একদিকে পেটে ক্ষুধার তাড়না অপরদিকে হাড়কাঁপানো শীত। সবকিছু মিলে যাদুকরের প্রাণ অতিষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু সব কিছু সে নীরবে সহ্য করে যায়। আর এই ভীষণ কষ্ট সহ্য করার মতো উপযুক্ত মানসিকতাও তার রয়েছে। তার মনটা আর পাঁচটা লোকের চেয়ে একটু বেশি সরল প্রকৃতির।

বারনাবাস ভাবে। দারিদ্র্য তাকে আরো বেশি ভাবতে সাহায্য

করে। তার হৃদয়ে ধারণা দৃঢ়মূল হয়েছে যে এই পৃথিবী অশুভ। অই বলে কিছু মানুষ বড়লোক আর কিছু মানুষ গরীব কেন হয় তা সে কোনদিন ভেবে দেখেনি। সবই তার সহ্যাতীত। অবশ্য সে ভাবে, মৃত্যুর পরে যে জগৎটা রয়েছে সেটা শুভ। সেখানেই বুঝি দুঃখ দারিদ্র্যের যোগাযোগ নেই। সেই বিশ্বাস তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। সে যীশুমাতা মেরীর মূর্তির সামনে একান্তভাবে প্রার্থনা করে— 'হে আমার ঈশ্বরী, আমাকে দেখো। এই পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকবো তোমার স্পর্শ যেন পাই। পরপারে আমি যেন স্বর্গের সুষমা লাবণ্য উপভোগ করতে পারি।'

একদিন সন্ধ্যাবেলা বারনাবাস একটু আশ্রয়ের অন্বেষণে বেরিয়েছে। সঙ্গে রয়েছে কার্পেটে জড়ানো তার প্রিয় তামার বল ও ছুরিগুলো। আজ সারাদিন সে কিছুই খায়নি। আজ বোধ হয় তাকে উপোস করেই কাটাতে হবে। কেননা আজ সে একবারও খেলা দেখাতে পারেনি বৃষ্টির জন্য। সে যেদিকে হাঁটছিলো সেইদিকেই যাচ্ছিল এক খ্রীষ্টান ধর্মযাজক। যাদুকর তাকে সম্মান প্রদর্শন করে অভিবাদন জানাতে ভোলে না। কথা বলতে বলতে ওরা এগিয়ে চলে।

ধর্মযাজক এক সময় তার শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখেন। লোকটা মন্দ নয়! 'বন্ধু, তোমার এমন সবুজ পোষাক কেন? তুমি কি নাটক কর?' ধর্মযাজক বিস্ময়ভরা চোখে জিজ্ঞেস করেন।

যাদুকর তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়, 'না, না, আমার নাম বারনাবাস আমি যাদু দেখিয়ে বেড়াই। তাই আমার গায়ে সবুজ পোষাক দেখছেন। কিন্তু এর থেকে আমার রোজগার যৎসামান্য। রোজ যদি খেতে পেতাম, তাহলে আমার আর কোন সংশয় থাকতো না যে এটাই হল দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট পেশা।'

ধর্মযাজক তার কথা কেড়ে নিয়ে বলতে শুরু করে, 'বারনাবাস, তোমার মনে থাকা উচিত একমাত্র ধর্মযাজকের কাজ হল পৃথিবীর মধ্যে সেরা পেশা।'

ধর্মযাজকের সহজ সরল কথাগুলো বারনাবাসের কর্ণমূলে প্রবেশ করে। একসময় নিজের ভুল স্বীকার করে সে বলে ওঠে, 'ফাদার, আমি যা কিছু বলেছি, তা ভুল করেই বলে ফেলেছি। আপনার পেশার সঙ্গে আমার এই সামান্য ভেলকী খেলার কোন তুলনা চলে না। আমার এই খেলাগুলোর মধ্যে হয়তো আমার দক্ষতার প্রকাশ ঘটে, অর্থাৎ নাকের ডগায় যখন ভারী জিনিস নিয়ে খেলা দেখাই তখন চারদিক থেকে বাহবার গুঞ্জন ওঠে—কিন্তু আপনার বিরাট গুনের কাছে আমি নেহাৎই ছেলেমানুষ। আমার ভুলের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন ফাদার। আমারও ইচ্ছে করে, আমি ধর্মসঙ্গীত গাই। আমারও ইচ্ছে করে, যীশুমাতা মেরীর মূর্তির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে অন্তরের বেদনা প্রকাশ করি। আমি যীশুমাতা মেরীকে ভালবাসি। কিন্তু আমার এই ভেলকী আমাকে স্বস্তি দেয় না। শহরের পর শহরের মানুষগুলো হয়তো আমাকে এক নিঃশ্বাসে চিনবে। তবু হে ফাদার, একজন যাজকের জীবনের বিনিময়ে আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবিকা ছেড়ে দিতে বিন্দুমাত্র পিছপা নই।'

ধর্মযাজক অত্যন্ত খুশি হলেন যাদুকরের কথায়। তাকে এক মুহূর্তেই ভালবেসে ফেললেন। তার দুঃখকে তিনি বুঝলেন। আরো কাছে ডেকে তিনি তাকে বললেন 'বন্ধু' চলো আমার ওখানে। আমি একটি মঠের প্রধান ধর্মযাজক। সেখানেই তুমি থাকবে। তোমার আর কোন দুঃখ থাকবেনা।'

বারনাবাস তাঁর কথায় রাজী হয়ে গেল। এখন সে মঠের একজন ধর্মযাজক।

মঠের প্রধান ধর্মযাজক বই লেখেন। তিনি বিদ্বান, গুণী মানুষ তাঁর লেখার মধ্যে বুদ্ধি এবং দক্ষতার ছাপ রয়েছে। মরিস যাজকের লেখা বইগুলোর কপি করে পার্চমেণ্টের ওপরে। আর ছবি আঁকেন আলেকজাণ্ডার। ছবিগুলো অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে ওঠে। ছবিতে দেখা যায়, যীশুমাতা মেরী বসে রয়েছেন সোলোমনের রাজসিংহাসনে। তাঁর পায়ের কাছে প্রহরারত চারটে সিংহ। তার চারপাশে

জ্যোর্তিবলয়। এছাড়া চারদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে সাতটি পায়রা, যেগুলো পবিত্র আত্মার প্রতীক বলে মনে হয়। যেগুলো প্রকাশ করা হয়েছে ভয়, তিতিক্ষা, জ্ঞান, শক্তি, বিচারক্ষমতা, বুদ্ধি ও শিক্ষার মাধ্যমে। এছাড়া বিনয়, শান্তি, সম্মান, কৌমার্য ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতীকস্বরূপ যীশুমাতার সঙ্গে রয়েছে সোনালী চুলের কুমারী মেয়েরা।

মঠে উপাসকরা যীশুমাতা মেরীর মূর্তির সামনে তাদের অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। দিনরাত তাঁরা ঐ নিয়েই সময় কাটিয়ে দেয়। মারবোদে হল আর একজন উপাসক, যার কাজ হল নানান পাথর নিয়ে মেরীর মূর্তি তৈরি করা। তার সারা শরীর সব সময় নোংরা আবর্জনায় ঢেকে রয়েছে। মূর্তি গড়তে গড়তে তার মাথা, দাড়ি, চোখ সব ধুলোয় ঢেকে যায়। চোখে তার অযুত বিস্ময়। মাঝে মাঝে কাজ করতে করতে তার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে। চোখদুটো ফোলা ফোলা মনে হয়। বয়স হলে হবে কি, মারবোদে ভীষণ পরিশ্রমী। অত্যন্ত সহজ সরল শিল্পী। তার ধ্যান জ্ঞান মা মেরীকে নিয়ে। তার গড়া মাতার মূর্তির চারপাশে রয়েছে মুক্তোর জ্যোর্তিবলয়। মূর্তিটা কোথায় খুঁত রয়ে গেল, কিংবা কোথায় কাজ বাকি রয়েছে তাই করতে করতে তার দিন চলে যায়। কখনো বা সে যীশুমাতার ছেলেবেলার মূর্তি তৈরি করতে ব্যস্ত থাকে।

মঠে উপাসকদের মধ্যে কেউ কেউ কবিতা কিংবা ধর্মসঙ্গীত লেখে। ঐগুলো লেখা হতো বেশির ভাগ ল্যাটিন ভাষায়। সবই মেরীকে উদ্দেশ্য করে। মাতার অলৌকিক সব ক্ষমতা নিয়ে তারা স্থানীয় ভাষায় কবিতা রচনা করতো। বারনাবাসের তা দেখে অত্যন্ত দুঃখ হতো। মেরীমাতার আশীর্বাদ ধন্য হওয়ার জন্য যারা এমনভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ হতো তাদের কথা ভেবে বারনাবাসের অন্তর কেঁদে উঠতো। সে বলতো, 'হে আমার মাতা, আমি তো লেখাপড়া শিখিনি। আমি তো ওদের মতো কিছুই রচনা করতে পারিনা। হে আমার মাতা, আমি মুর্খ আমার কোন জ্ঞান নেই।

আমার মধ্যে রয়েছে শুধু অফুরন্ত ভালবাসা। আমি কিছুই লিখতে পারিনি। এমনকি কোন প্রবন্ধও না। কিংবা কোন মূর্তি গড়বো, সে ক্ষমতাও আমার নেই। ওদের মত করে কবিতায় তোমাকে গুণগান করার মতো কোন ক্ষমতাই আমার নেই।' সে অত্যন্ত দুঃখ করে। এক সময় তার সমগ্র শরীরে মনের সেই ছাপ প্রকটিত হয়।

কিন্তু কিছুকাল পরে বারনাসের মুখে কিছুটা হাসি ফোটে।

একদিন সন্ধ্যায় মঠের যাজকেরা গল্প করছিলেন। তারা একটি যাজকের প্রসঙ্গ টেনে বলছিল যে, ঐ যাজকটি কেবল মেরীর নাম ছাড়া কিছুই আবৃত্তি করতে জানতো না। তাই নিয়ে অন্যান্যরা হাসাহাসি করতো। কিন্তু ঐ যাজকটি যখন মারা গেল, তার মুখে ফুটে উঠল পাঁচটি গোলাপ। যার অর্থ সে অত্যন্ত পবিত্র ছিল। সে মাতা মেরীর করুণায় ধন্য হয়েছিল।

এইকথা শুনে বারনাবাস কিছুটা আশ্বস্ত হলেও তার মন অনেকটা মুষড়ে দুমড়ে রয়েছে। সে এইভাবেই তার জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়না। সে মাতার নামে কিছু উৎসর্গ করতে চায়। কিন্তু সে মাতার নামে কি দেবে? তার যে কিছুই নেই। দিনের অধিকাংশ সময় সে শিল্প বিজ্ঞান সাধনায় সময় অতিবাহিত করতো।

হঠাৎ একদিন সে ছুটে গিয়ে যীশুমাতার মূর্তির সামনে বসে থাকে। একঘণ্টারও বেশি সময় সে এইভাবে বসে থাকে। তারপর ফিরে আসে। তারপর আবার যায়। এইভাবে যখন কোন ভিড় থাকতো না ঠিক তখনই সে উপাসনাগৃহে প্রবেশ করতো।

এখন আর বারনাবাসের মনে কোন দুঃখ নেই।

কিন্তু অন্য ধর্মযাজকদের কৌতূহল জাগে। বারনাবাস একা একা উপাসনালয়ে ঢোকে কেন? সে ওর ভেতর কি করে? তাদের মনে সন্দেহ দেখা দিল।

প্রধান ধর্মযাজক একদিন দু'জন যাজককে সঙ্গে নিয়ে ফোঁকর গলে বারনাবাসকে দেখার চেষ্টা করলেন।

ওঁরা যা দেখল, তাতে আশ্চর্য না হয়ে পারলো না।

ওরা দেখতে পায়, বারনাবাস যীশুমাতা মেরীর মূর্তির সামনে মাথা মাটিতে রেখে পা ওপরে তুলে তার তামার তৈরি সেই ছুটো বল আর বারোটা ছুরি নিয়ে পা দিয়ে লোফালুফির খেলা দেখাচ্ছে। এই ভেলকী খেলা দেখিয়ে সে প্রচুর নাম করেছে। আজ মেরী মাতার সামনে সে তার সেরা খেলা দেখাচ্ছে। মেরীমাতার সেবা ভক্তির জন্য তার এর চেয়ে বেশি দেবার আর কিছুই নেই।

বারনাবাসের কীর্তিকলাপ দেখে প্রধান ধর্মযাজকসহ অন্য ছু'জন প্রচণ্ড রেগে গেলেন। মেরীমাতার মূর্তির সামনে এসব কি হচ্ছে! মেরিমাতাকে অসম্মান করা হচ্ছে। উপাসনাগৃহ অপবিত্র করে তোলা হচ্ছে।

কিন্তু প্রধান ধর্মমাজক জানেন, বারনাবাস অত্যন্ত সাদাসিদে মানুষ। তার মনে কোনপ্রকার অসৎ বুদ্ধির চিহ্ন নেই। তবু তিনি ভাবলেন লোকটা বুঝি বুদ্ধি-সুদ্ধি সব খুইয়ে বসে আছে।

এমন সময় ওরা তিনজনই বারনাবাসকে উপাসনাগৃহ থেকে বের করে দেবেন বলে ঢুকে পড়লো।

কিন্তু ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল এক অভাবিত ঘটনা।

ওরা দেখতে পেল যীশুমাতা কুমারী মেরী ধীরে ধীরে বেদী থেকে নেমে এসেছেন। তিনি বারনাবাসের কাছে পৌঁছে তাঁর নীল পোশাকের ভাঁজ দিয়ে যাছুকরের কপালের ঘাম মুছিয়ে দিলেন।

প্রধান ধর্মযাজক শ্বেতপাথরের মেঝেয় মাথা ঠেকালেন। তিনি বললেন, 'নিষ্পাপ মানুষরাই ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ করতে পারে।'

অন্য ধর্মযাজকেরাও মেঝেয় মাথা ঠেকিয়ে মেরী মাতার সামনে তাদের নম্রতা প্রকাশ করলো।

বৃদ্ধ মাঝি ও সমুদ্র

আর্ণেষ্ট হেমিংওয়ে

বৃদ্ধ মাঝির নাম সান্টিয়াগো। বয়স হলেও এখনও শরীরে বেশ জোর আছে। সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার উৎসাহ এতটুকু কমেনি। বৃদ্ধদের মতো ঘরে বসে বসে পুরনোদিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে শুধু ভেবে সময় কাটাতে চায় না। যখন বয়স কম ছিল তখন সমুদ্রের বুকে নৌকা ভাসিয়ে ছিপ ফেলে মাছ ধরতেই সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেত, আর প্রতিদিনের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা তাকে টেনে নিয়ে যেত সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়ানোর জন্য। সমুদ্রের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বড় মাছ টোপ খেলে তাকে খেলাতে কত সময় চলে যেত সেদিকে কোন খেয়ালই থাকত না। সুতোর টানে সারা হাতে কেটে যাওয়ার দাগ পড়েছে। শরীরের গড়ন বরাবরই একটু রোগাটে ধরণের। সংসারে বৃদ্ধের আপন জন বলতে এখন আর কেউ নেই। স্ত্রী মারা গেছে অনেকদিন হল। দেয়ালে তার একটা ছবি টাঙানো ছিল। ঘরে থাকলে বারবার ছবির দিকে দৃষ্টি চলে যায়, তখন নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়। এই নিঃসঙ্গতা সহ্য করার মতো শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে, তাই একদিন ছবিটা খুলে নিয়ে এমন জায়গায় রেখে দিল যাতে সহজে নজরে না পড়ে। তবুও ঘুরে ফিরে স্ত্রীর কথা মনে পড়ে, বাড়িটা খুব ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। একা থাকার যন্ত্রণা মনে খুব কষ্ট দেয়।

এক সময়ে জেলেপাড়ায় সান্টিয়াগোকে এক ডাকে সবাই চিনত। এই তল্লাটে তার মতো ভালো মাছ শিকারীর জুড়ি খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। একা একা চলে যেত সমুদ্রে ডিঙি আর ছিপ নিয়ে, বড় বড় মাছ ধরে তবে পাড়ে ফিরে আসত। কোনদিন শূন্য হাতে কেউ তাকে ফিরতে দেখেনি। এইভাবে সাফল্যকে সে অনায়াসেই আয়ত্ত

করে নিয়েছিল। কিন্তু এখন সময় খুব খারাপ যাচ্ছে। নিজেই ভেবে পায় না কেন সবকিছু এত পাল্টে গেল। গত ৮৪ দিন ধরে অনেক চেষ্টা করে ছিপ দিয়ে একটাও বড় মাছ ধরতে পারেনি। বয়সের ভারে চেহারা খুব রোগা দেখালেও তার উজ্জ্বল চোখদুটো এখনও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমুদ্রের শান্ত জলের মত চোখদুটো ধীর স্থির এবং নীল। তার চোখের দৃষ্টির গভীরতা দেখলেই বোঝা যাবে জীবনের সব প্রতিকূল অবস্থাকে মোকাবিলা করার মত শক্তি এখনও হারিয়ে যায়নি, কিছুতেই পরাজয় মেনে নিতে রাজি নয়।

জেলে পাড়ার একটি ছেলে বুড়োর সঙ্গে মাছ ধরতে যেত। তার নাম ম্যানোলিন। ছেলেটা বুড়ো মাঝিকে খুব ভালবাসত। কেন বুড়ো তার মনকে টানে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারত না। হয়তো নিঃসঙ্গ বুড়োর প্রতি এক সমবেদনা মনের মধ্যে ঠাঁই করে নিয়েছিল, তারজন্যই তাকে বারবার ছুটে যেতে হত বুড়োর কাছে। সে প্রথম ৪০ দিন বুড়োর সঙ্গে ডিঙিতে মাছ ধরতে গেছে। কিন্তু প্রতিদিন ফিরেছে কিছুটা নিরাশ হয়ে। তেমন মাছ না পাওয়ার জন্য তার বাড়ির লোক বলে দিল, ওর ডিঙিতে মাছ-ধরতে যাবি না, বুড়োটা খুব অপয়া।

বাড়ির লোকের কথা সহজে মেনে নিতে পারেনি ম্যানোলিন। কিন্তু উপায় নেই। তাই বাধ্য হয়ে ওকে বুড়োর সঙ্গ ছাড়তে হয়েছে। অন্য জেলেদের ডিঙিতে সে এখন মাছ ধরতে যায়। তবু বুড়ো সান্টিয়াগোকে সে আগের মতই ভালবাসে। প্রচুর মাছও পায়। আজ সন্ধ্যেবেলা যখন সান্টিয়াগো খালি হাতে ফিরে এসেছে, ম্যানোলিন অত্যন্ত করুণ চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল। এর জন্য ছেলেটার মনটাও খুব খারাপ হয়েছে। বসে আর থাকতে পারেনি, উঠে এগিয়ে গেল বুড়োকে সাহায্য করতে। ডিঙি থেকে মাস্তুল, সুতোর গুলি, বল্লম প্রভৃতি তুলতে সাহায্য করল। ছেলেটা এইভাবে প্রতিদিন বুড়োকে সাহায্য করে। কারণ মাছ ধরতে যেটুকু সে শিখেছে তা ঐ বুড়ো সান্টিয়াগোর কাছ থেকে। যে প্রতিদিন

যথারীতি একটু একটু করে শিক্ষা দিয়ে বড় করেছে তাকে গুরুর সম্মান দেয়াই তো প্রয়োজন।

একদিন সন্ধ্যেবেলা বুড়ো সাগর থেকে ফিরেছে শূন্য হাতে, ম্যানোলিন এগিয়ে গেছে সাহায্য করতে। বুড়োর ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসা কিছুতেই মেনে নিতে পারেনা ছেলেটা। গুরুকে সাহায্য করার জন্য খুব বাসনা জেগে উঠেছে মনে, তাই সে বলল, আমি কারো কথা শুনবো না, আমি তোমার ডিঙিতেই মাছ ধরতে যাব, তাতে যে যা খুশি বলুক। আমি টাকা পয়সাও জমিয়েছি কিছু।

সান্টিয়াগো বাধা দিয়ে বলল, না, না, আমার সঙ্গে যাবে কেন ? যে ডিঙিতে মাছ উঠছে সেটাতেই যাওয়া ভাল। পরিশ্রম করে তার ফল না পাওয়া গেলে কি চলে ?

তোমার মনে নেই সেবার কদিন তুমি মাছ পাওনি। তারপর তিন হপ্তা ধরে কত বড় বড় মাছ তুমি ধরেছিলে।

সাফল্যের উজ্জ্বলতা মাখানো দিনগুলোর কথা ভুলতে পারে না সান্টিয়াগো। চোখে তাই আনন্দের ঝিলিক তুলে বলল, মনে থাকবে না কেন ?

তবু আমাকে তোমার সঙ্গে নেবে না কেন ? তুমি যতই আপত্তি কর, আমার কিন্তু তোমার সঙ্গেই মাছ ধরতে যেতে ভাল লাগে। মাছ না উঠুক সবদিন, আমি সঙ্গে থাকলে তোমাকে তো সাহায্য করতে পারব।

বুড়ো ম্যানোলিনকে সঙ্গে নিয়ে রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকেছে। বুড়ো একটু বিয়ার খাবার জন্যই এখানে এসেছে। বয় এসে বিয়ার দিয়ে গেলে বুড়ো খেতে খেতে বলল, আচ্ছা তোর মনে আছে তুই যখন আমার সঙ্গে প্রথম মাছ ধরতে গেলি তখন তোর বয়স যেন কত ছিল।

পাঁচ। যেদিন তুমি ইয়া বড় একটা মাছ ধরেছিলে। আর কি জোর ছিল মাছটার গায়ে। ডিঙিতে তোমার সঙ্গে সঙ্গে এমন দাপাদাপি শুরু করেছিলো, মনে হচ্ছিল যেন এখনই ডিঙিটা ভেঙে যাবে।

বুড়ো সান্টিয়াগো হেসে ছেলেটার দিকে তাকায়। সেই কতদিনের পুরনো কথা এখনও মনে রেখেছে দেখে খুব ভাল লাগে। চোখের দৃষ্টিতে রয়েছে অপরিসীম স্নেহ। এমন একজনকে কাছে পেলে নিঃসঙ্গতার ব্যথা কিছু কমত। তাই কিছুসময় নিজের মনে কি যেন ভাবলো, তারপর বলল, তুই যদি আমার ছেলে হতিস আমি তোকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম, যা থাকে কপালে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আবার চলে এসেছে সমুদ্রের পারে। ডিঙিটা পাড়ে তুলে রেখে গিয়েছিল যাতে ঢেউয়ের আঘাতে ভেসে না যায়। ডিঙি থেকে জিনিসপত্তর তুলতে তুলতে ম্যানোলিন জিজ্ঞেস করল, তোমার কি টোপ লাগবে?

লাগবে। টোপ ছাড়া মাছ ধরব কি করে? কাল ভোরে যে আবার মাছ ধরতে বেরোব।

তুমি মাছ ধরার কায়দা এত ভাল করে শিখেছ যে অন্য কারোর সঙ্গে তোমার কোন তুলনাই চলে না।

সান্টিয়াগো হেসে বলল, তুই-ও একদিন আমার মতো হয়ে উঠতে পারবি। আমি শিখেছি কত কষ্ট করে। সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে অনেক নতুন কায়দা নিতে হয়েছে, এইভাবে আমি একটু একটু করে শিখেছি।

ম্যানোলিন একহাতে নিল কাঠের বাক্স, তার মধ্যে রয়েছে সুতো, কোঁচ, বর্শা। মাছ জলে ভেসে উঠলে কোঁচ আর বর্শা দিয়ে মারতে হয়। অন্য হাতে টোপের বাক্স। বুড়ো নিল ডিঙির মাস্তল যার সাহায্যে পাল টাঙানো হয়। সব নিয়ে দু'জনে পৌঁছল একটা কুটিরের সামনে। এটাই সান্টিয়াগোর ডেরা। সান্টিয়াগো আগে ভেতরে ঢুকলো ম্যানোলিন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের জিনিসগুলো রেখে এসে ছেলেটাকে ভেতরে নিয়ে গেল। ঘরে ঢুকে চারদিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে। সত্যিই এমন ফাঁকা ঘরে একা থাকলে মন খারাপ না হয়ে পারে না।

রাত হয়েছে, ম্যানোলিনকে বাড়িতে ফিরতে হবে। বুড়ো রাতে খাবার কি ব্যবস্থা করেছে ছেলেটা জানে না। হয়তো সারারাত

না খেয়েই কাটিয়ে দেবে। এই অবস্থায় কিছু না জেনে চলে যেতে মন চাইছেনা। তাই ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, রাত্তিরে কি খাবে ?

হাঁড়িতে নিশ্চয়ই কিছু আছে। তোর কি খিদে পেয়েছে ? তুই কিছু খাবি ?

না, না, আমার খিদে নেই। তুমি কি রাঁধবে, আমি কি উনুনটা ধরিয়ে দেব ?

কি দরকার উনুন ধরাবার ?

সান্টিয়াগো ঠিক জানে হাঁড়িতে কিছু নেই। কিছু ছেলেটাকে তা জানাবার কোন চেষ্টা করল না। ও চলে যাবার সময় বলে গেল খুব সাবধানে থাকবে যাতে ঠাণ্ডাফাণ্ডা না লেগে যায়। এটা সেপ্টেম্বর মাস ভুলে যেওনা।

বুড়ো হেসে বলল, আমার ঠিক মনে আছে। বড় বড় মাছ ধরার এই তো সময়। বুড়ো কিছু না বললেও ছেলেটা বুঝেছিল হাঁড়িতে কিছু নেই। কিছু খাবার না দিয়ে গেলে সারারাত খিদেয় কষ্ট পাবে। তাই হোটেল থেকে খাবার এনে দিয়ে গেল। ওকে আবার ফিরে আসতে দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তুই আবার এসেছিস কেন ? বাড়িতে ফিরতে তোর অনেক দেরী হয়ে যাবে রে।

আমার জন্য তুমি কিছু ভেবনা। তোমার খাবার নিয়ে এসেছি, এগুলো এখনই খেয়ে নাও।

তুই আমার জন্য এত ভাবিস বলেই হয়তো তোকে আমার ছেলের মতো ভাবি।

এই কথার কোন উত্তর না দিয়ে গুড নাইট বলে চলে যাবার আগে বলল, রাতে ভালো করে ঘুমুবে। ভোরে উঠে আবার তো ডিঙা নিয়ে বেরোবে।

ম্যানোলিন চলে গেল। বুড়ো খাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে পড়েছে। একসময় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ঘুমোতে ঘুমোতে স্বপ্ন দেখে, আফ্রিকার সোনালী সমুদ্র তীর। আশ্চর্য, সারাদিন সমুদ্রের বুকে ডিঙি নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েও রাতের বেলায় ঘুমের মধ্যে

সমুদ্র ছাড়া আর কিছুই স্বপ্ন সে দেখেনা !

ভোর হতে না হতেই ম্যানোলিন এসে হাজির। সঙ্গে এনেছে বঁড়শিতে গাঁথার টোপ। সান্টিয়াগো তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল ছেলেটার জন্য। ওর সাথে দেখা না করে যেতে ইচ্ছে করছিল না। ডিঙি নিয়ে বেরোবে। বোতল ভর্তি করে খাবার জল নিল। কিন্তু খাবারদাবার কিছু নিল না। দুপুর বেলায় আজকাল বুড়োর কেন যেন খেতে ইচ্ছে করে না। বেরোবার আগে ছেলেটা বলল, আজ তোমার কপাল খুলবে, বঁড়শিতে বড় মাছ নিশ্চয়ই ধরা পড়বে। ছেলেটার শুভ কামনায় বুড়ো আনন্দ প্রকাশ করল। ডিঙি ভাসল সমুদ্রে। এখনও রাতের অন্ধকার বন্দরের ওপর তার হালকা আঁচল বিছিয়ে রেখেছে। ধীরে ধীরে মাটির গন্ধ দূরে সরে যাচ্ছে। বুড়ো সান্টিয়াগো দাঁড় বেয়ে তার ডিঙিটাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল আরো গভীর সমুদ্রের বুকে। সকাল হয়ে আসছে। এখন সমুদ্র শান্ত, এত সুন্দর যেন আকাশের দেবতা অকৃপণ ভাবে বইয়ে দিয়েছে এ পৃথিবীর বুকে অফুরন্ত করুণার স্রোত। তার মনে পড়ে, স্পেনে সমুদ্রকে যারা ভালবাসে তারা বলে—নারী।

ভোরের শান্ত সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে ডিঙিটা। তারপর একসময় সান্টিয়াগো চারটে বঁড়শিতে টোপ গেঁথে ফেলল। এতক্ষণে সূর্য উঠেছে। উদীয়মান সূর্যের আলো এসে পড়েছে শান্ত জলে। কিন্তু তার প্রতিবিম্বের দিকে বুড়ো তাকাতে পারে না, চোখে লাগে। আর এখন সেই সৌন্দর্য উপভোগ করার দিকে মন দিতেও চায় না। সে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে গভীর জলে নেমে যাওয়া বঁড়শির সুতোগুলো দেখল। মনে মনে ভাবল, প্রতিটা দিনই জীবনে এমনভাবে নতুন করে আসে। সমুদ্রে তার এই নতুন দিনের যাত্রা শুরু হয়েছে সেই ভোরবেলায়।

সান্টিয়াগো সমুদ্রের বুকে ডিঙি নৌকায় ভাসতে ভাসতে একবার দূর তীরভূমির দিকে তাকাল। দেখল, আকাশে মেঘ জমা হচ্ছে। দূর সীমানায় নীল বন-রেখা, তার পেছনে ধূসর পাহাড়, আর চারদিকে

সমুদ্রের নীল জল। দেখতে দেখতে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে এল বঁড়শির সুতোর ওপর। চোখে পড়ে ছোট ছোট মাছগুলো ওপরের জলে মনের আনন্দে খেলা করছে। ছোট ছোট মাছ যেখানে থাকে সেখানে বড় বড় মাছও থাকতে পারে।

বুড়ো মনে মনে তার ভাবি শিকারের উদ্দেশ্যে বলে, কই হে টোপ খাও। অনেকক্ষণ ধরে সেই আসায় বসে আছি। আর দেরী না করে লক্ষ্মীটি টপ করে গিলে ফেল দেখি টোপটা। কি ? ইচ্ছে করছে না। আচ্ছা, আচ্ছা, বেশতো যদি ইচ্ছে হয় তুপাক ঘুরে এস।

কত সময় চলে গেল, টোপটা গিলল না। ধৈর্য না হারিয়ে বৃদ্ধ সান্টিয়াগো তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে ফাৎনার দিকে। হাতে সুতো ধরা। এইভাবে এক উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে কত মুহূর্ত পার হয়ে গেল।

এক সময় হঠাৎ তার মনে হলো, সুতোটা বড্ড ভারী। টানও ধরেছে একটু একটু, টানটা ক্রমশঃ বাড়ছে। বুড়ো সুতো ছেড়ে যায়। মনে মনে বলে—অনেক খেলিয়ে ব্যাটা শেষপর্যন্ত টোপটা গিলেছে। বাপু খুব ভাল করে গিলে ফেল যাতে বঁশড়িটা তোমার বুকের মধ্যে বিঁধতে পারে। পাকা শিকারী সান্টিয়াগো বুঝতে পারল টোপটা ঠিকমত গিলেছে। এবার সে শক্ত সুতোয় হাত দিয়ে বাড়ি মারতে শুরু করল, যাতে বঁড়শিটা মাছের বুকে মোক্ষম বিঁধে যায়, খুলে যাবার কোন সুযোগ না থাকে। তারপর একটু টানে সুতোটা। কিন্তু এক ইঞ্চিও টানা গেল না। ওরে বাপরে ! কিসের মধ্যে গিয়ে বিঁধেছে বঁড়শিটা ! তবু নিশ্চিন্ত, সুতোটা বেশ শক্ত, সহজে ছিঁড়বে না।

মাছটা তখন বঁড়শি মুখে নিয়ে সমুদ্রের গভীর জলে সামনের দিকে এগোতে থাকে। সান্টিয়াগো ভাবে যাক বাবা খুব নিশ্চিন্ত, ব্যাটা এগোচ্ছে, আরো গভীরে তো তলিয়ে যাচ্ছে না, যত গভীরে যাবে তত শক্ত হবে মাছটাকে জল থেকে ডিঙিতে তুলে আনা। যদি এখন ছেলেটা কাছে থাকত, তবে দেখত, বড় মাছ ধরা কাকে বলে, কী কায়দায় বড় মাছ ধরতে হয়।

ডিঙিটা এখন চলছে উত্তর পশ্চিম দিকে। মাছটা জলের ভেতর

খেলেই চলেছে, কখনও কিছু উপরে উঠছে, আবার গভীরে নেমে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও বঁড়শিটা বুক থেকে খুলতে পারছে না। এইভাবে মাছটা কখন ক্লান্ত হয়ে ধরা দেবে সেই অপেক্ষায় বসে আছে সান্টিয়াগো। এমনি করে চার ঘণ্টা কেটে গেল। বুড়ো মাছটাকে বলল, বাছাধন একবার জলের ওপর ওঠ, তোমাকে দেখি।

কিন্তু মাছটা বুড়োর কোন কথা শোনে না। এইভাবে ডিঙিটাকে টেনে নিয়ে চলল দূর সমুদ্রের দিকে। সারাটা দিন কেটে গেল, সূর্য ডুবতে চলেছে। সুতো ধরে রাখতে রাখতে হাতটায় খিল ধরার অবস্থা। সুতোর ঘষা লেগে রক্ত পড়ছে। কিন্তু কি মাছ ওটা? গায়ে এত শক্তি? এত সময় ধরে খেলেও ক্লান্ত হয়ে পড়ে না? সুতো টানছে তো টানছেই। তবে ব্যাটা নিশ্চয়ই পুরুষের বাচ্চা লড়াই করতে জানে, সহজে হার মানবে না। এমনি করে হয়তো সারাটা রাত কেটে যাবে।

বুড়ো মনে মনে বলে, এ তো বেশ ফ্যাসাদ বেধে গেছে। মাছটা আমাকে নিয়ে কিছু করতে পারছে না, আর আমিও মাছটাকে নিয়ে কিছু করতে পারছি না। আহা ছেলেটা সাথে থাকলে এখন নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসত। হাত দুটোয় খিল ধরে উঠেছে। কতক্ষণ লড়াই চালানো সম্ভব বুঝে উঠতে পারছি না।

খুবই আশ্চর্য লাগছে। সান্টিয়াগো জীবনে এমন মাছের সঙ্গে লড়েনি। সমুদ্রের গভীরে মাছটাও যেমন একা চলেছে, সমুদ্রের ওপরে সেও ঠিক তেমনি একা চলেছে। কাউকে সাহায্য করার কেউ নেই।

রাত্তিরে মাছটা একবার লাফ দিয়ে জলের ওপর উঠল, সঙ্গে সঙ্গেই আবার জলে ডুব দিল। মাছটা দেখতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড় গেল ডিঙিতে। নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসে দেখল ডিঙিটা আবার আগের মত চলছে কোন বিপদ ঘটেনি।

সুতোয় আবার খুব টান পড়ে। বুড়ো বলে, তুমি আর কতক্ষণ ধরে টানবে বাপু। অনন্তকাল ধরে তো আর টানতে পারবে না।

এক সময় তোমাকে থামতে হবেই। কিন্তু শোন বাপু না মরে যাওয়া পর্যন্ত আমি তোমার সঙ্গে আছি।

রাত কেটে ভোর হয়েছে সমুদ্রের বুকে। সান্টিয়াগো দেখল ডিঙিটা এখন উত্তর মুখে চলেছে। সুতোয় টানটা যেন একটু কম মনে হচ্ছে? হয়তো হবে ব্যাটা ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে আসছে।

বুড়ো আবার সেই মাছটার সঙ্গেই যেন কথা বলে, দেখ সোনামাণিক আমি তোমাকে খুব ভালবাসি। কিন্তু জেনে রাখো যতই তুমি বেয়াদপি করো না কেন, আজ সন্ধের আগেই তোমার খেলা আমি শেষ করব।

সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি, তাই জব্বর খিদে পেয়েছে সান্টিয়াগোর। ডিঙিতে খাবার কিছু নেই। উপায় খুঁজে না পেয়ে সে ছোট ছিপ ফেলে কয়েকটা 'টুনা' মাছ ধরল। ছুরি দিয়ে মাছের ছাল ছাড়িয়ে খেল। খিদের মুখে যা জুটেছে তাই অমৃত। জিহ্বার স্বাদ মেটাবার কথা ভাবলে না খেয়েই থাকতে হতো। তবু একটু নুন আর এক টুকরো লেবু হলে খাওয়াটা খুব জমত! সান্টিয়াগো হঠাৎ মাছটার কথা ভাবতে শুরু করে, আচ্ছা আমি তো বেশ খাচ্ছি কিন্তু ঐ টোপ গেলা মাছটা কি করবে? আহা বেচারা তো কিছু খেতে পারছে না। কী আর করা যাবে—ওকে মারতে হবে বলেই আমার শরীরে কিছু তাগদ ধরে রাখা দরকার।

হঠাৎ ডিঙিটার সামনে সমুদ্রের বুক ফুলে উঠল। মাছটা উঠছে। মাছটাকে পুরোপুরি দেখতে পেয়ে সান্টিয়াগোর চক্ষুচড়কগাছ। আরে বাপরে! এ যে দেখছি আমার ডিঙিটার চেয়ে লম্বায় দু ফুট বড়। একদিক থেকে রক্ষে। মাছটার যদি বিদ্যাবুদ্ধি থাকত তবে লেজে বাড়ি মেরেই এই ডিঙি আর আমাকে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দিতে পারত। কিন্তু মাছের সেই বিদ্যেবুদ্ধি জুটবে কোত্থেকে।

সান্টিয়াগো তবু নিশ্চিন্ত হতে পারে না, মনের মধ্যে ভয় একটু একটু করে জাঁকিয়ে বসছে। তাই মনে মনে যীশু এবং মা মেরীর কাছে প্রার্থনা করে বলে, আমি ধার্মিক নই, এই মাছটা মারার জন্যই

শুধু তোমার কাছে শক্তি ভিক্ষা করছি।

সান্টিয়াগো নিজের মনে সাহস আনতে চায়। অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে তার। একবার এক মস্ত নিগ্রো পালয়ানের সঙ্গে সে পুরো একদিন একরাত পাঞ্জা লড়েছিল। হাড্ডাহাড্ডি সে লড়াই। শেষপর্যন্ত নিগ্রোটা পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এমন লড়াইয়ে যে জিততে পারে সে কী কম বড় বীর! সে যে প্রতিযোগিতায় জিতে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে!

অনেক সময় পেরিয়ে যাবার পর সান্টিয়াগোর মনে হলো মাছটা আর এগোচ্ছে না, ডিঙিটার চারদিকে চক্কর দিচ্ছে শুধু। ও বলে, এবার তোমার খেলা শেষ হয়ে আসছে বাছাধন, আমি বুঝতে পারছি। একবার তুমি লাফ মারবে। আবার মাছটাকে দেখা গেল। জলের ভেতর একটা বড় কালো ছায়া, শুধু ল্যাজটা একটু উঠে আছে জলের ওপরে। কিন্তু পুরো শরীর জলের ওপর না তুলে আবার জলের তলায় নেমে গেল। বুড়ো বলে, এবার একটু মাথা ঠাণ্ডা কর, আর মানুষের মত কষ্ট সহ্য করতে শেখ।

কিন্তু মাছটা আর কষ্ট সহ্য করতে পারছিল না। আবার জলের ওপরে ভেসে উঠল। সান্টিয়াগো দেখল, মাছটা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে ডিঙির দিকে। এতক্ষণ যে তার সঙ্গে তীব্র লড়াই চালিয়েছিল সেই এখন আত্মসমর্পণ করার জন্য এগিয়ে আসছে। সান্টিয়াগোর মনে হঠাৎ একটা বেদনার সুর বেজে ওঠে।

এবার মাছটা চিৎ হয়ে পড়ে। সান্টিয়াগো শক্ত হাতে বর্শা তুলে মাছের শরীরে আমূল গেঁথে দেয়। এতবড় আঘাত সহ্য করার মতো শক্তি আর নেই। মৃতুর হাত থেকে রেহাই পেল না মাছটা। মৃত মাছটাকে ডিঙির সঙ্গে বেঁধে ফেলল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে সে রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। জলের রঙ রক্তের মতো লাল। সান্টিয়াগো মনে মনে কাঁদে এখন তোকে শেষে মেরে ফেলতেই হল!

যাত্রা শেষ। এবার ঘরে ফেরার পালা। ক্লান্ত সান্টিয়াগো

ছেঁড়া পালটা তুলে দেয় ডিঙিতে। হাওয়া টেনে নিয়ে যাবে ডিঙিটাকে বন্দরের দিকে। এতক্ষণ যেন এক যুদ্ধ পরিচালনায় ব্যস্ত ছিল, এখন যুদ্ধ শেষ। তার কিছু করার নেই। ডিঙি কখন বন্দরে ভিরবে তার জন্য প্রতীক্ষা।

কিন্তু আবার একটা বড় বিপদ দেখা গেল। মাছটার রক্তের গন্ধ পেয়ে বড় বড় হাঙ্গর এসে জুটেছে। খুবলে খুবলে খেয়ে ফেলল মাছটাকে। সান্টিয়াগো বর্শা দিয়ে আক্রমণ করল হাঙরগুলোকে। মনে মনে বলল, মানুষ পরাজয়ের জন্য নয়, সে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কিন্তু সে কিছুতেই পরাজয় মেনে নিতে পারে না।

সমুদ্রের বুকে সকাল হয়ে আসছে, সান্টিয়াগো বন্দরে ফিরে এসেছে সে দেখল মাছটাকে হাঙরে খেয়েই শেষ করেছে। শুধু বিরাট শিরদাঁড়াটা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। সব জয়ের মধ্যেই একটা বেদনা মিশে থাকে।

ভোর হতেই ম্যানোলিন এসে হাজির। বুড়ো তখন তার কুটিরে শুয়ে ঘুমাচ্ছে।

এদিকে বন্দরে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেছে—ওরেব্বাপ ১৮ ফুট লম্বা মার্লিন মাছ জীবনে কেউ দেখেনি।

বুড়ো সান্টিয়াগো অবশ্য এসব কিছুই জানে না। সে তখন বিছানায় শুয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে আর স্বপ্ন দেখছে, আফ্রিকার সমুদ্র উপকূলে সিংহের বাচ্চাগুলো মনের আনন্দে খেলা করছে।

ম্যানোলিন বিছানার পাশে শান্ত হয়ে বসে অপেক্ষা করছে কখন বুড়ো সান্টিয়াগোর ঘুম ভাঙবে।

ইউরা

বরিস পাস্টারনাক

উপস্থিত কৌতূহলী জনতার চোখের সামনে দিয়ে শববাহকের দল এগিয়ে চলেছে শ্মশানের দিকে, প্রকৃতির বুকে তখন ছড়িয়ে রয়েছে হেমন্তের রিক্ততা। ওরা শ্মশানে এসে পৌঁছবার পর শুরু হল নিয়মমাফিক বিবর্ণ দার্শনিকভাব মিশ্রিত শোকসঙ্গীত। মৃত দেহটা কবর দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে, আস্তে আস্তে মাটির নিচে চাপা পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে এসে দাঁড়ালো দশ বারো বছরের একটি বালক। তার চোখের দৃষ্টিতে এক শূন্যতার হাহাকার, তার বুকে যেন হেমন্তের প্রকৃতির নিঃসঙ্গতা চিরকালের জন্য স্থান করে নিয়েছে। পাকা ফসলের মতোই তাকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে মায়ের বুক থেকে। সকলের কথা বলা বন্ধ হয়ে গেলে ছেলেটি কি যেন বলতে চাইল, কিন্তু বলতে পারল না। তার কণ্ঠস্বর থেমে গেছে চাপা কান্নায়। তাই সকলের চোখ থেকে কান্নাকে আড়াল করার জন্য সে মুখ ঢেকে নিল। মামা নিকোলে নিকোলেভিচ সান্ত্বনা দেবার জন্য এগিয়ে গেলেন ছেলেটির কাছে। বোন মারিয়ার কবরের দিকে একবার বেদনার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছেলেটির হাত ধরলেন। তারপর খুব দ্রুত সেখান থেকে চলে গেলেন।

সে রাতের জন্য তারা কবরখানার পাশেই একটি কুঠরিতে আশ্রয় নিল। কুঠরির চারদিকে সবজি ক্ষেত। কুঠরি থেকে একটি সরু রাস্তা সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে ক্ষেতের বুক চিরে। সবজি ক্ষেতের ওপাশে তার মা শুয়ে আছে বরফ জমানো ঠাণ্ডা মাটির বিছানায়। ক্ষেতের একপাশে বাঁধাকপির চাষ করা হয়েছে, আর সীমানার শেষে রয়েছে একটি চওড়া দেওয়াল যার পাশ ঘেঁষে একেশিয়ার ঝোপ। বাতাসের প্রচণ্ড দাপাদাপি শুরু হয়েছে ঝোপের মধ্যে।

বাইরে এখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, ঘরের ভেতরের উষ্ণতাকে বাইরের ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা করার জন্য বড় বড় জানালার কপাটগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঝোড়ো বাতাসের উন্মত্ত গর্জন আছড়ে পড়ছে জানালার কাঁচের ওপর, তাতে ইউরার বুক কেঁপে উঠছে ভয়ে। বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে মায়ের কথা মনে পড়ল, একবার ইচ্ছে হল ছুটে বাইরে গিয়ে দেখে আসে মা এখন কি করছে, দুর্দান্ত শীতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারছে কি না।

কিন্তু পারল না, বাইরের তুষার ঝড় এত বেপরোয়াভাবে চারদিক তোলপাড় করে তুলছে যে ইউরা আরো বেশি ভয় পেল। অসহায়ের মতো কাঁদতে শুরু করল, ওর কান্নার শব্দ শুনে নিকোলের ঘুম ভেঙে গেছে। উনি ইউরাকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন, যখন ইউরা শান্ত হল, তখন পূবের আকাশে লাল রঙের আলোর রশ্মি ছড়িয়ে সূর্য উঠছে।

ছোটবেলায় ইউরা বাবার কাছে যাবার জন্য খুব বায়না করত। তাকে বোঝানোর জন্য সবাই বলেছিল যে তার বাবা বিদেশে চাকরি করেন। বাবার আন্তরিক স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে ইউরাকে ছোটবেলায় অনেক অদ্ভুত ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। মা প্রায়ই অসুখে ভুগতেন, তাই মায়ের চিকিৎসার জন্য তাকে মায়ের সঙ্গে প্রায়ই দক্ষিণ ফ্রান্সে অথবা উত্তর ইটালিতে যেতে হত। এখনও চেষ্টা করলে ইউরার মনে পড়ে বহু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কথা যার সঙ্গে তার বাবা অত্যন্ত নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এখনও স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পায় তাদের সেই স্বপ্নের মতো সুন্দর শান্ত ছায়াচ্ছন্ন বাড়িটা।

গ্রীষ্মকালে কোন এক উত্তপ্ত দুপুরে ইউরা চলেছে মামার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে দুপাশে সোনালী সারি সারি গাম গাছের শোভা দেখতে দেখতে। সমস্ত গ্রামটা নিস্তব্ধ, এক নিশ্চলতার বুকে আশ্রয় নিয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে ইউরার। কেবলমাত্র দু একটা পাকা ফসলের লম্বা শীষ মাথা উঁচু করে চেয়ে আছে দূরে,

পাহারা দেবার ভার নিয়েছে যেন কেউ না এসে আবার শস্যগুলো কেড়ে নিয়ে যায়।

গাড়িতে করে যেতে যেতে নিকোলে ফসলভরা মাঠের দিকে তাকালেন একবার, তারপর জিজ্ঞাসা করলেন পাভেলকে, এই ফসলের মালিক কে? পাভেল কোন একজন খ্যাতিমান লেখকের সহকারী। পাভেল নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিকোলেকে সেই লেখকের কাছে। পাভেল নিজের প্রয়োজনেই চলেছে সেখানে, প্রকাশকের কাছ থেকে সংশোধিত প্রুফগুলি নিয়ে লেখকের কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। পাভেল আর নিকোলে যখন কৃষি সমস্যা সংক্রান্ত আলোচনায় ব্যস্ত তখন ইউরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে চারদিকে তাকিয়ে দেখছে। রাস্তার দুপাশে ঘন ঝোপ দেখলেই তার মনে হচ্ছে এইবার হয়তো আজন্ম পরিচিত মাঠ, নদী চোখের সামনে এসে উপস্থিত হবে। তাদের দেখতে না পেলেও মনে মনে অনুভব করে উদার উন্মুক্ত বিশাল প্রকৃতি হাতছানি দিয়ে ডাকছে কোন অজানা সুদূরের দিকে নিয়ে যেতে।

একই সঙ্গে নিকোলের মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দিগন্তবিস্তৃত নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে সে উপলব্ধি করে এক নতুন বোধ, এক সত্য, এক আনন্দ। তিনি তখনও বুঝতে পারেননি যে এই অনুভূতির সার্থক প্রকাশ ঘটাতে পারলে একদিন ইউরা বিখ্যাত হয়ে উঠবে এই পৃথিবীর অন্যান্য খ্যাতিমান মানুষের মতো। শান্ত সুন্দর পরিচ্ছন্ন ডুপ্লিয়ানকা গ্রামের প্রকৃতি অকৃপণ স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে ইউরার সারা দেহেমনে, তার মনে হচ্ছে মা বুঝি জীবন্ত হয়ে ক্লান্ত শরীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে পরিচিত মমতা নিয়ে। প্রকৃতি প্রেমিক মামার কাছে থাকতে তাই ভালো লাগে ইউরার।

ঐ বাড়িতে ইউরা একটি পরিচিত মুখের দেখা পাবে, তার নাম নিকি ডুডোরভ। স্কুলে একই সঙ্গে পড়াশোনা করেছে। ইউরাকে দেখে নিশ্চয়ই আনন্দে এগিয়ে আসবে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। সেই কথা মনে আসতেই ও কিছুটা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে।

বাড়িতে পৌঁছে ইউরা নিকির দেখা পেল না। সারা বাড়িটা তন্নতন্ন করে খুঁজে নিকিকে না পেয়ে ইউরা চলে এল বাগানে খালের ধারে। বাতাসে ফুলের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে, দূরে কোথাও মধুর সুরে বাঁশী বাজছে, পাখিরা সুরেলা কণ্ঠে ভরিয়ে দিচ্ছে চারদিক, এমন মোহনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ডুবে গিয়ে ইউরা অনুভব করতে লাগল হারিয়ে যাওয়া মায়ের উপস্থিতি। যেদিকেই যায় ওর মনে হল মা যেন অনুসরণ করছেন, আর হাতছানি দিয়ে ডাকছেন কাছে যাওয়ার জন্য, আনন্দে সমস্ত শরীরে এক অদ্ভুত শিহরণ খেলে গেল। ও তখন হাতজোড় করে কান্নাভেজা গলায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে শুরু করল মায়ের আত্মার শান্তি কামনায়। এত মনোযোগ দিয়ে প্রার্থনা করছিল যে চারদিকে কোথায় কি ঘটছে সেদিকে কোন খেয়াল ছিল না। মামার ডাক কানে গিয়ে পৌঁছতেই ওর হুঁশ ফিরে এল। সঙ্গে সঙ্গেই মাটি থেকে উঠে দাঁড়াল ইউরা, সামনের দিকে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থমকে গেল, মনে এল বাবার কথা, আর একদিন তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা যাবে এই ভেবে সামনের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল।

ইউরাকে মানুষ করার দায়িত্ব এসে পড়েছে নিকোলের কাঁধে। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি, কোন জায়গার পরিবেশ ইউরার মনের মতো হবে তাই বুঝে উঠতে কিছু সময় চলে গেছে। অবশেষে এই বাড়িতে ইউরাকে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এখানে ইউরা বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পেরেছে। বাড়ির কর্ত্রী আনা এবং তার দুই ছেলেমেয়ে নিশা আর টোনিয়া ইউরাকে আর বাইরের কেউ বলে মনে করে না, দুজনেই দর্শন আর আইনের স্নাতক পরীক্ষা দেবে। ইউরাও এখন ডাক্তারি পরীক্ষা দেবার জন্য ব্যস্ত।

ছোট বয়স থেকেই ইউরার ঝোঁক ছিল ইতিহাস আর শিল্পকলার ওপর। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজন এমন কিছু শেখার ইচ্ছাটাও মন থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেনি। আর সেজন্যই সে ডাক্তারি পড়তে শুরু করেছে।

মাটির নিচে অন্ধকার ঘরে তরুণ তরুণীর মৃতদেহ কাটতে কাটতে কতদিন সে মানবদেহের সৌন্দর্যের উৎস সন্ধান করেছে, কতদিন তাদের বিচ্ছিন্ন সত্তার পৃথক সৌন্দর্য উপলব্ধি করে রোমাঞ্চিত হয়েছে। কতদিন কল্পনায় ভর করে মৃত্যুর গভীর অপার রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে আর কবরের কাছে গিয়ে একা দাঁড়িয়ে থেকে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছে।

আজও সেইসব ভাবনা এসে শবব্যবচ্ছেদে ব্যস্ত মনকে অন্যমনস্ক করে তোলে। কিন্তু তার এই অন্যমনস্কতা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, তাই সে এতটুকু বিচলিত নয়।

ইউরা ভাবে, বড় হয়ে আর সে কবিতা লিখবে না, তখন সে লিখবে জীবনের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধির ভিত্তিতে এক মনোমত জীবনদর্শন, ইউরা বুঝতে পারে পাঁকে পদ্মফুল ফোঁটার প্রকৃত তাৎপর্য কি। সে বুঝতে পারে মানুষ জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা থেকে সঞ্চয় করে অভিজ্ঞতা, আর সেই অভিজ্ঞতাগুলি তাকে পৌঁছে দেয় নতুন এক উপলব্ধির জগতে। ওর মনে পড়ে যায় মামার লেখা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত বইগুলি। সেখানে মামা প্রকাশ করেছেন সুগভীর দার্শনিক উপলব্ধিগুলি, রূপে রসে-ছন্দে-অলঙ্কারে এমন মনোজ্ঞ উপস্থাপনার জন্য ইউরাকে খুব আকর্ষণ করে।

এই রচনাগুলির মধ্যে খৃষ্ট-ধর্মের এক নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই রচনাগুলি নিশাকেও গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে, তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কোন ক্ষেত্রে প্রবাহিত হবে তা নির্ধারণের জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু ইউরা শুধুমাত্র এখানেই থেমে থাকতে চায়নি। তার অসীম কৌতূহল তাকে এগিয়ে নিয়ে চললো আরো সামনের দিকে। সে লিখলো শুধুমাত্র আদর্শ জীবনকে চালিত করতে পারে না, সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। নিশা সে পথে যেতে পারে নি। ইউরা বোঝে তার কারণ। জাতিগত বৈশিষ্ট্য তাকে কোন পরিবর্তনের পথে যেতে দেয় নি তাই সে শুধুমাত্র আদর্শকে অবলম্বন করতে চায়। ইউরা মনে মনে প্রার্থনা

করলো নিশার জন্য ঈশ্বরের কাছে, নিশা যেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সাহায্যে বাস্তব জীবনের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে।

একদিন ইউরার কলেজ থেকে বাড়ি ফিরতে ফিরতে একটু দেরি হয়ে গেছে। তখন প্রায় সন্ধ্যে, বাড়িতে ঢুকে শুনলো আনা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি আনার ঘরে ঢুকে দেখে চারদিকে ওষুধের বাক্স আর ইঞ্জেকশনের শিশি ছড়ানো। ইউরাকে দেখে আনা ভেঙে পড়লেন, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আনা যেন কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। ইউরা আরো কাছে এগিয়ে এসে আনাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

ইউরা চুপ করতেই আনা ধীরে ধীরে বলল, তোমার কি মনে হয় আমি বাঁচব ইউরা ? এক মুমূর্ষু রোগিনীর কাছ থেকে এ কথা শুনে ইউরা বিব্রত হয়ে পড়ল, এ অবস্থায় কি বলা উচিত ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। তারপর নিজেকে সংযত করে রোগিনীকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল। নিশা কখন ঘরে এসে ঢুকেছে ইউরা টের পায়নি, নিশা জীবন, মৃত্যু আর রোগ নিয়ে এক বিরাট বক্তৃতা দিয়ে দিল, ওর মুখ থেকে এমন দার্শনিক কথাবার্তা শুনে চমকে উঠল ইউরা।

আনা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে গেলেন। ব্যাপার কিছুই বুঝতে না পেরে ইউরা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে নার্সকে ডেকে দিল রেগিনীর কাছে যাবার জন্য। পরের দিন থেকে আনার অবস্থার উন্নতি ঘটতে লাগল।

তারপর থেকে আনা ইউরা আর টোনিয়াকে ঘন ঘন ডেকে পাঠাতেন তাঁর ঘরে। ওদের সঙ্গে গল্প করে সময় কেটে যেতো কিভাবে বুঝতে পারতেন না। বাল্যকালের গল্প শোনাতেই বেশি ভালবাসেন আনা, গল্প শুনতে শুনতে ইউরা এক কল্পনার জগতে পৌঁছে যায়।

সেদিন ইউরা টোনিয়ার সঙ্গে বসে গল্প করছে আর হাসাহাসি করছে এমন সময় আনা ডেকে পাঠালেন দুজনকে, ঘরে ঢুকতেই ইউরাকে কাছে ডেকে বললেন, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। কি কথা

না শুনেই ইউরা হঠাৎ বলে উঠল, আমি জানি আপনি বলতে চাইছেন কেন আমি পৈতৃক সম্পত্তিটার ভাগ ছেড়ে দিলাম। আসলে আমি চাই না কোন হিংসা আর নোংরামির সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে। কেমন একটু অধৈর্যের সুর মিশেছে কথায়।

ইউরার মনোভাব বুঝতে পেরে থেমে গেলেন আনা, তারপর ধীর কণ্ঠে বললেন, আমি তোমার কথা অস্বীকার করছিনা। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তিটা বিনা মামলায় ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি বলে আমার মনে হয়। আরো কিছু বলতে চেয়েছিলেন কিন্তু কাশির ধমকে সব কথা চাপা পড়ে গেল। ক্রমাগত কেশেই চলেছেন, ফলে দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হল।

ওরা দুজনে আরো কাছে এগিয়ে গেল। ওদের হাত দুটো একসঙ্গে ধরে আনা বললেন, তোমরা দুজনে বিয়ে করে ফেল। আমি আশীর্বাদ করছি তোমরা সুখী হও। ওরা অবাক হয়ে দেখল, আনার দুচোখ জলে ভরে গেছে।

টোনিয়ার সঙ্গে বেরিয়েছে ইউরা আনার নির্দেশে স্ভেনটিৎস্কিদের বাড়িতে খ্রীষ্টমাস উৎসবে যোগ দেবার জন্য। টোনিয়ার পাশে বসে ইউরা ভাবছিল প্রতিযোগিতায় পাঠানো স্নায়ুতন্ত্র বিষয়ক প্রবন্ধটি সম্পর্কে। টোনিয়া ভাবছিল তার মায়ের ভবিষ্যৎ নির্দেশের কথা। ইউরা মাঝে মাঝে ভাবে যে ছোটবেলার খেলার সাথী আর সবসময়ের সঙ্গী কত তাড়াতাড়ি নির্বাচিত হয়ে গেল আজীবনের সঙ্গিনী হিসাবে। এই কথা যখনই মনে আসে ইউরার সারা শরীর কেঁপে ওঠে বারবার।

রাস্তার বুকে গাড়ির চাকার ঘরঘর শব্দ ভেসে এসে চিন্তাকে বারবার আঘাত করছিল। একবার মনে হলো বাড়িতে আনা অসুস্থ, টোনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আসা উচিত হয়নি, বাড়িতে মায়ের পাশে থাকলে তার দেখাশুনা করতে পারত।

শীতে জমে যাওয়া বাড়িগুলো আর রাস্তার দিকে তাকিয়ে ইউরার মনে হচ্ছিল যেন কোন মানুষ সাদা পোষাক পরে দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। রাস্তায় মানুষের কোলাহল যেন উৎসবে মেতে উঠেছে।

উৎসবের কোলাহল শুনতে পাচ্ছে ইউরা। মানুষগুলোকে দেখে ইউরার মনে হল এখনই একটা প্রবাদ রচনা করা যেতে পারে। কিন্তু এখনই নয়, ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে ভেবে দেখবে তাই তাড়াতাড়ি নিজেকে গুটিয়ে নিল।

ওদের পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলে হৈ চৈ করতে ব্যস্ত, ইউরা আর টোনিয়া সেখানে যোগ না দিয়ে ফ্ল্যাটের অন্যদিকে এগিয়ে গেল। উৎসবমুখর বাড়িতে হঠাৎ শোনা গেল গুলির শব্দ। সকলে উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। এখানে আর থাকার ইচ্ছে নেই ইউরার। টোনিয়াকে সঙ্গে নিয়ে সে দ্রুত এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। ওরা গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়িটা বিদ্যুৎ বেগে দূরের রাস্তায় মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

কয়েকদিন পর আনা মারা গেল, ফুসফুসে জল জমেছিল। মায়ের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ টোনিয়াকে দেখে ইউরার মনে পড়ে গেল ছোটবেলায় দেখা নিজের মায়ের মৃত্যুর কথা। মায়ের মৃত্যুতে ইউরা খুব বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সব সময় তার মনে হত সে বড়ো একা। তার এই একক সত্তার আলাদা কোন মূল্য নেই এই বিরাট পৃথিবীতে। ইউরার মনে পড়ল তার সান্ত্বনাদায়িনী শুশ্রূষাকারিণী করুনাময়ী ধাত্রীর কথা, যার স্নেহমমতার স্পর্শে এই পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে আসতো। মনে পড়ল স্বর্গীয় পবিত্রতায় ভরা গলির ধারের ছোট বাগানটার কথা যেখানে সে নার্সের হাত ধরে রোজ বেড়াতে যেত।

সেদিনকার সেই বিচিত্র কৌতূহল আজ ইউরার আর নেই। ইউরা মায়ের আত্মার শান্তির জন্য সেদিন যেমন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিল কিন্তু আজ আর তা পারল না। কারণ ইউরা এখন যৌবনে পদার্পন করে পরিণত প্রজ্ঞার অধিকারী হয়ে উঠেছে।

ইউরাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সারা বাড়িতে তাই হুলুস্থুলু পড়ে গেছে। নিচে কফিনের মধ্যে রাখা হয়েছে আনার মৃতদেহ, তাঁর চারপাশ ঘিরে রয়েছে বহু শোকার্ত নর-নারী। সেই ভীড়ের মধ্যেই ছিল ইউরা, তাই কেউ ওকে দেখতে পায় নি। একটু পরে

আনার কফিন কাঁধে তুলে নিয়ে সকলে লাইন করে এগিয়ে চললো শ্মশানের দিকে। কবরখানার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কেউ কেউ নানারকম মন্তব্য করছিল। কিন্তু ইউরার মন সেদিকে ছিল না। ওরা এসে পৌঁছেচে। ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া কবরের মাটির দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ে গেল এই মাটিতেই ওর মাকে কবর দেওয়া হয়েছিল। অনেক বছর আগে যেভাবে অসহায় ইউরা তার মাকে হারিয়ে কান্নাভেজা গলায় ডেকে উঠেছিল, আজও ঠিক তেমনি করে ও অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল 'মা'। এই ছোট্ট শব্দটা দিক থেকে দিগন্তে মিলিয়ে যেতে লাগলো আর ইউরার সারা শরীর অনাস্বাদিত রহস্যময় অনুভূতিতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, এক অনাবিল আনন্দে তার শরীর অবশ হয়ে যেতে শুরু করল।

দূর থেকে ইউরা দেখতে পেল টোনিয়া কালো পোষাক পরে বিষণ্ণ মুখে বাবার হাত ধরে এগিয়ে চলেছে গির্জার উঠোনের কোণে। এখানেই সেদিন ইউরা প্রচণ্ড তুষার ঝড়ে ভয় পেয়েছিল। শোকস্তব্ধ জনতার থেকে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে ইউরা। ওর স্বপ্ন ওর চিন্তা ওকে ক্রমশঃ উত্তেজিত করে তুলছে এই ধ্বংসের মধ্য থেকে নতুন কিছু সৃষ্টি করার জন্য।

সিদ্ধান্ত নিল আনার মৃত্যুকে স্মরণ করে সে একটা শোকগাথা লিখবে। তারজন্য যদি প্রয়োজন হয় কিছুদিনের জন্য এ বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাবে। তার কবিতায় থাকবে সেই বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার স্মৃতি।

ইউরা অনেক এগিয়ে গেছে, তাই সে থমকে দাঁড়াল। পিছনে যারা ছিল তারা সামনে এসে যেতেই সে মিশে গেল ভীড়ের মধ্যে। তারপর শুরু করল সকলের সাথে পথ চলতে।

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে রাশিয়াতে। এমনই এক দিনে স্ত্রী টোনিয়াকে নিয়ে এল হাসপাতালে। ডাক্তার টোনিয়াকে ঘরে নিয়ে পরীক্ষা করছে। ইউরা বসে আছে একা, জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো ইউরা। দেখল বৃষ্টির ফোঁটা এসে আছড়ে পড়ছে

বারান্দার ফাঁকে আর কার্ণিশে। বাতাসের প্রচণ্ড গতি এসে উপড়ে দিচ্ছে সামনের লতা গাছটিকে। টোনিয়া তিনদিন পর এক শিশু সন্তানের জন্ম দিল। ইউরার মনে হলো ও যেন এক দেবদূত, স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে মর্ত্তলোকে। তাই খুশীতে আর আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠল ইউরা। এরপরেই খবর পেল ওকে চলে যেতে হবে কোন বড় হাসপাতালে, ওখানে ডাক্তারের খুব অভাব।

যুদ্ধের ভয়াবহতা ইউরা দেখতে শুরু করেছে নিজের চোখে। চারদিকে শুধু পচাগলা বীভৎস মৃতদেহের ছড়াছড়ি। ঘুরতে ঘুরতে এমন এক বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছে যে একটি গুলির আঘাতে যে কোন সময়ে প্রাণ বিপন্ন হতে পারে। অসংখ্য হত আর আহত মানুষের ভিড় রাস্তার ওপর। তাদের আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস বিষাদময় হয়ে উঠেছে। একটা গাড়ি এসে অত্যন্ত দ্রুত আহতদের তুলে নিল।

হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে একজনকে স্ট্রেচারে করে। তার চোয়ালের হাড়ে বোমার টুকরো গেঁথে গেছে, চোয়ালের মাংস ঝুলে পড়ে মুখটা বীভৎস আকার ধারণ করেছে। চিকিৎসা করার সুযোগ না দিয়ে লোকটি একটু পরেই মারা গেল।

গাড়িতে করে বেরিয়েছে ইউরা সঙ্গে তার বন্ধু মিশা গর্ডন। গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই দৃষ্টি থেমে গেল এক বৃদ্ধ ইহুদীর ওপর অকথ্য নির্যাতন চলতে দেখে। একটা লোক তামার মুদ্রা ছুঁড়ে ছুঁড়ে খেলাচ্ছে বৃদ্ধাকে, আর চাবুকের আঘাত পড়ছে অনবরত বৃদ্ধের পরিবারের সকলের ওপর। ওরা কাঁদছে কিন্তু এই মরণ খেলা কিছুতেই কেউ থামাবার সাহস করছেনা। ইউরা গাড়িতে বসেই গলা বাড়িয়ে লোকটিকে ধমকালো। তারপর নিজের মনেই বলল, ঈশ্বরই জানেন এই অত্যাচার কবে শেষ হবে। তার সেই বিষাদ গর্ডনকেও স্পর্শ করল। গর্ডন বন্ধুকে সমর্থন করে বলে তুমি হয়তো ঠিকই বলছ ইউরা, কিন্তু এ নিয়ে দুঃখ করে কোন লাভ নেই। এই পৃথিবীতে পাপ আর হত্যা ছেয়ে গেছে, বিষাদে ভরে গেছে পৃথিবীর

আকাশ বাতাস।

বাইবেলে বলে, বাঁচতে হলে, মানুষ হিসাবে সম্মান পেতে হলে, মানুষকে জাত হিসাবে বিভেদের কথা ভুলতে হবে। মানুষকে উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে, ব্যক্তির সত্তাকে সেখানে সবথেকে উঁচুতে তুলে ধরা হয়েছে। যীশুর এইসব অমূল্য উপদেশের কথা সবাই ভুলে গেছে।

সাধারণ মানুষ নিজেদের সুবিধার জন্য বড়কেও ছোট বলে ভাবতেই বেশি ভালবাসে। তাই দৃষ্টি সংকীর্ণ হয়ে আসে। যে মহাপ্রাণ একদিন জন্মেছিল ইহুদীদের মধ্যে, কিন্তু ইহুদীরা সমগ্র ইউরোপে মনুষ্যত্বের পুনর্জাগরণ ঘটাতে তাকে চিনতে পারল না, তাই আজ ওদের ওপর নেমে এসেছে অভিশাপ, লাঞ্ছনা আর অবজ্ঞা। ইহুদী বুদ্ধিজীবীরা পারে না সব সংকীর্ণতা ভুলে গিয়ে উদার পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে মনুষ্যত্বের জয়গান শোনাতে। সকলের সঙ্গে মিশতে তারা আজও ভীত ও কম্পিত।

পরের দিন সকালবেলায় ইউরার কাছে এসেছে বদলির অর্ডার। এখানকার পরিবেশ সম্পর্কে ইউরার মনে যে নোংরা আর কার্য ধারণা গড়ে উঠেছিল, চলে যাবার কথা ভাবতেই এখানকার প্রতিটা ধূলিকনাই অত্যন্ত আপন বলে মনে হচ্ছে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে ইউরা চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, এমন সময় শুনতে পেল আকাশ ফাটিয়ে লাল গোলার বীভৎস গর্জন, চাকরের কাছ থেকে জানতে পারল জার্মানরা এ গ্রাম আক্রমণ করেছে, এখনই সকলকে পালাতে হবে।

একটা গাড়ি নিরাপদে ওকে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। গাড়ি থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে বাড়ির পথ ধরলো। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই এক গোলার টুকরো এসে বিঁধল ইউরার গায়ে, সঙ্গে সঙ্গে চেতনা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। যখন জ্ঞান ফিরেছে ও দেখল হাসপাতালের খাটে শুয়ে আছে।

এই হাসপাতালে নার্সের কাজ করছে লারা। ওর স্বামী পাশা

গিয়েছিল যুদ্ধে, সেখানে সে মারা গেছে। তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে লারা বিস্মিত আর স্তম্ভিত। হাসপাতালে থাকার সব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, তাই ভাবল এবার সে চলে যাবে মেয়ে কাটিয়ার কাছে। বাকি জীবনটা সন্ন্যাসিনীর মতো ওখানেই কাটিয়ে দেবে।

ইউরা সুস্থ হয়ে উঠেছে। লারার কথা চিঠিতে জানিয়েছে টোনিয়াকে। মেলিউজেইয়েভো নামের ছোট্ট শহরের এক হাসপাতালে কাজ করার জন্য চলে এসেছে ওরা দুজনে। সারাদিন হাজার রকম কাজের মধ্যে এদের ব্যস্ত থাকতে হয়। এক জায়গার কাজ শেষ হলে অন্য জায়গার কাজ সামলানোর জন্য ওদের ডাক পড়ে।

হাসপাতালের চাকরি করতে বেশিদিন ভালো লাগেনি ইউরার। চাকরি ছেড়ে দেবার জন্য কাগজপত্র সই করতে মেয়রের অফিসে গিয়েছিল। সেখানকার মানুষগুলোকে দেখেছিল প্রয়োজনীয় কাজ ফেলে রেখে খোশগল্পে সময় কাটাতে ব্যস্ত থাকা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। এখান থেকে মস্কো চলে যাবার কথা ভেবেছে ইউরা। তাই আসন্ন ঝড় জল উপেক্ষা করেই বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। যেতে যেতেই দেখল মাঠের ওপর ছেলেমেয়েরা নিশ্চিন্ত মনে খেলা করছে, মায়েদের কোলে শুয়ে থাকা শিশুদের নিষ্পাপ সরল পবিত্র মুখগুলো। কিশোরেরা সুদক্ষ আর নিপুণ হাতে ভেড়ার দল চরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

ষ্টেশনে ঢুকতে যাবার পথে বাধা পেল ইউরা। অসংখ্য লোক সারি সারি প্লাটফর্মের ওপর সিঁড়ির চাতালে শুয়ে আছে। ওদের দিকে বিরক্তি ভরা দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে স্টেশন মাষ্টার বললেন, এই ট্রেনে আপনার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয় ডাক্তার, আপনি এর পরের ট্রেনেই যাবেন।

তাতেই রাজী ইউরা, এই গাড়ীতেও খুব ভীড় আর ঠেলাঠেলি। তার মধ্যে দিয়েই কোনরকমে ইউরা শরীরটাকে গলিয়ে দিয়ে কামরার ভেতরে ঢুকতে পেরেছিল। সুখিসিটিতে না পৌছানো পর্যন্ত এই গাদাগাদি আর ঠাসাঠাসি করে বসে থাকার থেকে মুক্তি নেই।

লোকজনের বিচিত্র চিৎকার শুনে মনে হলো ইউরার, কোন এক

বিক্ষুব্ধ ঢেউ চারদিক গ্রাস করে ফেলতে চায়। মাঝে মাঝে আসছে তারপরই আবার হারিয়ে যাচ্ছে। জানলা দিয়ে বাতাসে অজানা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে, কিন্তু এগিয়ে গিয়ে দেখার কোন উপায় নেই। মনের কল্পনা দিয়ে ভরিয়ে দিতে চাইল সেই চাওয়াকে। সুবাসিত ফুলের গুচ্ছ গুচ্ছ স্তবকে কে যেন ভরিয়ে দিয়েছে চারদিক, প্রাণভরে সে আঘ্রাণ নিল।

ভীড় কমে যেতেই শান্ত হয়ে বসলো ইউরা। কামরার ভেতর চারদিকে তাকিয়ে দেখেছে সে। হঠাৎ চোখে পড়ল পাশের সোফায় শুয়ে আছে এক দীর্ঘকায় তরুণ, তার কাছে রয়েছে বন্দুক, কার্তুজের বেল্ট, এসব দেখেই ইউরা বুঝতে পারলো তরুণটি একজন শিকারী।

এই তরুণের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ইউরা। তাই মাঝপথেই কথা থামিয়ে দিয়ে ওপরের বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়ল। তারপর কামরার মধ্যে আলোর প্রয়োজনে যে মোমবাতিটা জ্বলছিল সেটা নিভিয়ে দিতেই অন্ধকার এসে ঢেকে দিল চারদিক। তরুণ শিকারীর চরিত্র ইউরাকে খুব অবাক করেছে।

অন্ধকারে চুপ করে শুয়ে থাকতে হঠাৎ মনের ভেতরে জমিয়ে রাখা চিন্তাগুলো জীবন্ত হয়ে উঠল ইউরার কাছে। টোনিয়া, লারা আর সব পরিচিত মানুষ যেন সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে বেশি ভাবছে লারাকে নিয়ে। দেশের এই বিক্ষিপ্ত পরিবেশের মধ্যে লারা চিরবঞ্চিতা, হতাশাগ্রস্তা, রিক্তা। অসহ্য চিন্তার নিপীড়নে ওর মাথাটা উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, চোখের পাতা থেকে ঘুম উধাও হয়ে গেছে অনেক দূরে। তাই প্রচণ্ড অস্বস্তিতে অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করলো ইউরা।

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙেছে, উঠে দেখে ট্রেনটা এসে থেমেছে। এই জায়গা ইউরার খুব পরিচিত। ব্রেকফাষ্টের টেবিলে বসে আবার সেই শিকারী তরুণের সঙ্গে গল্প করছে। ওর কাছ থেকে অনেক খবর জানা গেল। ওর নাম পগয়েভশিখ, বিপ্লবী কাকার নামের গৌরব স্মরণ করে ওই নাম রাখা হয়েছে। ওর বাবা মা সেকেলে

ধরনের তাই কাকার সঙ্গে ওদের মতের মিল হয় না। ভালো শিকার করতে জানে একথাও জানিয়ে দিল ছেলেটি। তারপর নিজের নামের একখানা কার্ড পকেট থেকে বের করে ইউরার হাতে দিল। আর কথা বলতে ভাল লাগছিল না, তাই উঠে চলে গেল ইউরা।

দুরন্ত গতিতে ট্রেন ছুটে চলেছে। চলার পথের দুধারে প্রকৃতি সমস্ত সৌন্দর্য উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে। ইউরা ট্রেনের জানলার ধারে বসে দুচোখ দিয়ে গোগ্রাসে গিলছে। ট্রেনটা এখন ঘন বন ছাড়িয়ে পাশের আলুর ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে ছুটে চলেছে সামনের দিকে, তার পেছন দিকটা দিগন্তের শেষ সীমান্তের কাছে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

সূর্যের প্রখর আলোর বুকে চকচক করে উঠল কি একটা জিনিস, তারপর আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল, ট্রেনের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নেমেছে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। রূপোলি পর্দার মতো মনে হচ্ছে, সেই পর্দা সরিয়ে সামনের দিকে চোখ মেলে তাকালো ইউরা। দূরে পাহাড়, পাহাড়ের পাশ থেকে গীর্জা উঁকি দিল, তারপরই দেখল গম্বুজ চিমনি ছাদ নানা আকারের বাড়িঘর হঠাৎ দেখা দিয়েই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

এই শহরটা খুবই চেনা ইউরার, এর নাম মস্কো। ট্রেন এসে থেমেছে, ইউরা প্রস্তুত হয়ে নিল ট্রেন থেকে নামবার জন্য।

স্মলেনস্কি স্কোয়ারের ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলেছে গাড়ি, ইউরা বাড়িতে পৌঁছোবার জন্য উদগ্রীব। ও যখন বাড়িতে এসে পৌঁছাল তখন সূর্যের শেষ আলোটাও আকাশের বুক থেকে নিভে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে ইউরা দ্রুত পায়ে ঢুকল বাড়ির ভেতর। উত্তেজনায় তখন ওর হাত পা কাঁপছে। কলিংবেলটা বাজাবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে টোনিয়া। ইউরাকে দেখে অবাক হলেও আনন্দে ভরে উঠল মন। ঘরে ঢুকে বসেছে ইউরা, এখনও খুব পরিশ্রান্ত। টোনিয়া বলল হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে তারপর বিশ্রাম করো।

ইউরা টোনিয়ার সঙ্গে বাড়ির পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছে। টোনিয়া বলল, এ বাড়ির একতলার একটা অংশ একজন কৃষি বিশেষজ্ঞকে ভাড়া দিয়েছি। শুনে খুশি হলো ইউরা। ওর মনে পড়ে গেল এতদিন যে হাসপাতালে কাজ করে এসেছি সেটাও তৈরি করা হয়েছে কারো বসত বাড়িরই একটা অংশে। নিজের বাড়ির বাড়তি অংশটা অপরকে থাকার জন্য ছেড়ে দেবার মধ্যে উদারতার আনন্দ খুঁজে পেল ইউরা।

মামা নিকোলে নিকোলেভিচের সঙ্গে দেখা করার কথা বলল ইউরা। কিন্তু টোনিয়া তার উত্তরে বলল, উনি এখন কেমন যেন পাল্টে গেছেন। এখানে আসবেন বলে কথা দিলেও আসার কথা ভুলে যান।

মস্কো ছেড়ে চলে যাবার আগে ইউরা শুধু একবার হাসপাতালে গিয়েছিল ছেলেকে দেখতে। ঠাণ্ডার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাচ্চাদের আকুল করুণ কান্না শুনতে পাচ্ছিল ইউরা। গলার স্বর শুনে নিজের ছেলেকে সহজেই চিনতে পেরেছিল। আদর করে ছেলের নাম দিয়েছিল শাসা, ভালো নাম আলেকজাণ্ডার।

তারপর ছবিতে দেখেছে আর একবার তখন সে মাত্র এক বছরের শিশু। এইসব ভাবতে ভাবতে উপরে উঠে এল, জানলার ধার ঘেঁষে উঠেছে রূপোলি চাঁদ, সেদিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ে গেল বাল্যকালের হারিয়ে যাওয়া অনেক স্মৃতি।

ছেলের সামনে এসে দাঁড়াল ইউরা। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল ছেলে মুখের আদল পেয়েছে একেবারে মায়ের মতো। ইউরা হাত বাড়িয়ে কোলে নেবার চেষ্টা করলেও ছেলে কিছুতেই রাজী হল না। টোনিয়ার কথাও সে শুনতে চাইল না। অবশেষে ইউরাই ঘর ছেড়ে চলে গেল। পরেরদিন ইউরার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল চারপাশের জগতের খুব বেশি পরিবর্তন ঘটে গেছে, তার সঙ্গে কিছুতেই সে তাল মেলাতে পারছে না। নিজের জগতের মধ্যে তাই একা একা ডুবে গেল ইউরা।

'ডক্টর জিভাগো' উপন্যাসের অংশ বিশেষ

সমুদ্র-যিশু

আনাতোলি ফ্রাঁস

সেন্ট ভ্যালেরির বহু জেলে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের বুকে পথ হারিয়ে ডুবে মারা গিয়েছিল সে বছর। এই দুর্ঘটনার ন'দিন পরে ভাঙা নৌকার টুকরোর সঙ্গে তাদের মৃতদেহগুলো ঢেউয়ে ভেসে এসে আশ্রয় নিয়েছিল দূরের এক নির্জন বালুকাবেলায়। ক্ষত দেহগুলোর খোঁজ পেয়ে তাদের কফিনে ভরে খাড়াই সংকীর্ণ পথ বেয়ে সারি সারি যখন গির্জায় নিয়ে আসা হচ্ছিল, পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কালো ওড়নায় ঢাকা হতভাগ্য ক্রন্দনরত বিধবাদের মূর্তিগুলোকে দেখে মনে হচ্ছিল ওরা যেন সেই বাইবেলের সময়কার নারী।

এক সময়ে দলের নায়ক জঁা লেনোয়েল আর তার ছেলে দেজারকেও গির্জার মূল অংশে নিয়ে আসা হলো। এইখানে গির্জার ছাদ ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। জঁা লেনোয়েল একদিন যেখানে নিজের হাতে তৈরি করা মাস্তুল আর দড়িদড়া সমেত সুন্দর ছোট একটা খেলনার জাহাজ আমাদের কুমারী মাতার নামে উৎসর্গ করে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। সেন্ট ভ্যালেরি গির্জার যাজক মসিয়ে গীয়ম ক্রফেম আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করার সময় খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, গলার স্বর অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল, তিনি সেই অবস্থায় বললেন, জঁা লেনোয়েল আর তার ছেলে দেজারের চাইতে সৎ খ্রীশ্চান, হাসি-খুশি আর মিশুকে মানুষকে এর আগে কখনও পবিত্র মাটিতে শুইয়ে রাখা হয়নি ঈশ্বরের শেষ বিচারের দিনটির প্রতীক্ষায়।

সমুদ্রের মধ্যে যখনই যেখানে কোন ভরাডুবি ঘটে, সাধারণতঃ কয়েকটা দিন অতিক্রান্ত হতে না হতেই স্রোতের টানে ধ্বংসাবশেষের কোন না কোন চিহ্ন সৈকতে ভেসে আসে। সেদিনও খুব ভোরে কয়েকজন কিশোর যখন নৌকা চালিয়ে আসছিল তখন ওরা দেখতে পায় একটা দেহ জলে ভাসছে। দেহটা যিশুখৃষ্টের প্রতিমূর্তি।

মানুষের দেহের মাপে কাঠ খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে এবং রঙটাও মানুষের মতো। মূর্তিটা যে বেশ পুরনো দিনের তা দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। হাতদুটো দুপাশে ছড়িয়ে উনি সমুদ্রের ঢেউয়ে ভাসছিলেন। ছেলেরা ঠেলতে ঠেলতে মূর্তিটাকে সমুদ্রের পারে নিয়ে এল তারপর বয়ে নিয়ে গেল সেণ্ট ভ্যালেরির গির্জায়। মাথায় রয়েছে কাঁটার মুকুট, হাত আর পাদুটো ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু ক্রুশকাঠটা নেই হয়তো ঢেউয়ের আঘাতে পেরেক থেকে খুলে সমুদ্রের বুকে ভেসে গেছে। হাতদুটো তখনও দুপাশে এমনভাবে ছড়ানো রয়েছে যেন আত্মোৎসর্গ আর আশীর্বাদ করার জন্য প্রস্তুত। আরোমাথিয়ার জোসেফ আর পবিত্র নারীরা ওঁকে কবর দেবার সময়ে ঠিক যে অবস্থায় দেখেছিলো এখন মূর্তিটাকে যেন ঠিক সেই রকম দেখাচ্ছে।

ছেলেরা মূর্তিটাকে মঁসিয়ে গীয়ম লে কার ক্রফেমের হস্তে অর্পণ করলো উনি ছেলেদের বললেন, মূর্তিটা প্রাচীন ভাস্কর্য্যের আশ্চর্য সুন্দর নিদর্শন, যে এই মূর্তিটা তৈরি করেছে মনে হয় সে অনেকদিন আগেই মারা গেছে। যদিও আজকাল অ্যামিয়েন্স আর প্যারির দোকান থেকে একশ ফ্রাঁ কিংবা তার বেশী মূল্যে সুন্দর মূর্তি কিনতে পারা যায়, তবু বলব ওইসব মূর্তির তুলনায় এই প্রাচীন মূর্তির কারুকার্য নিঃসন্দেহে অনেক সুন্দর। আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হয়েছি এই ভেবে যে—প্রভু যদি এইভাবে দুহাত বাড়িয়ে সেণ্ট ভ্যালেরিতে এসে থাকেন তাহলে উনি নিশ্চয়েই জলে ডোবা মানুষগুলোকে আশীর্বাদ করার জন্যই এসেছেন এবং যে সব মানুষগুলো নিজেদের জীবন তুচ্ছ করে দূরের সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল সেইসব হতভাগ্য মানুষের প্রতি তাঁর কত যে গভীর সমবেদনা রয়েছে তা জানাতে চাইছেন।

মসিয়ে লে কার ক্রফেম খৃষ্টের প্রতিমূর্তিটাকে গির্জার ভেতর কাপড় দিয়ে ঢাকা এক বেদীর ওপর বসিয়ে দিলেন, তারপর বেরিয়ে পড়লেন ছুতোর লেমারের খোঁজে যে পারে ওক কাঠের গুড়ি দিয়ে একটা ক্রুশকাঠ বানিয়ে দিতে। ক্রুশকাঠ বানানো হয়ে গেলে মানবত্রাতা যিশুর মূর্তিটাকে নতুন পেরেকের সাহায্যে আটকে গির্জার অভ্যন্তরে উপাসনা

কক্ষের উঁচু বেদীটার ওপর স্থাপন করলেন। তখন সকলে প্রত্যক্ষ করলো স্বর্গীয় করুণা আর ক্ষমায় যিশুর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

গির্জার তত্ত্বাবধায়কদের একজন কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখেছিলেন ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তিটা ঠিক মতো বসানো হয়েছে কিনা, তাঁর মনে হলো তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন যিশুর দুই চিবুক বেয়ে অশ্রু-ধারা নেমে আসছে। পরের দিন ভোরে মঁসিয়ে লেকার ক্রফেম কোরাস গায়ক দলের একটি কিশোরকে নিয়ে যখন উপাসনার জন্য গির্জার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন, তিনি অবাক হয়ে দেখলেন বেদীর ওপর ক্রুশটাতে যিশু নেই, উনি পড়ে আছেন বেদীর নিচে।

এই ঘটনায় উনি খুবই মর্মাহত হলেন। কোন রকমে উপাসনা শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে ছুতোরকে ডেকে পাঠালেন,তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কাউকে কিছু না জানিয়ে কেন সে ক্রুশকাঠ থেকে যিশুকে আলাদা করে নিচে নামিয়ে রেখেছে। কিন্তু ছুতোর লেমার বিস্মিত হয়েছিল এমন অভিযোগ শুনে। সে শপথ করে বললো যে ক্রুশকাঠ থেকে যিশুকে খোলা তো দূরের কথা সে স্পর্শ-ও করেনি।

তখন গির্জার চৌকিদার এবং অন্যান্য সবাইকে জিজ্ঞেস করে মঁসিয়ে ক্রফেম জানতে পারলেন বেদীতে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তিটাকে স্থাপন করার পর আর কেউ গির্জার অভ্যন্তরে প্রবেশই করেনি।

নিতান্ত তুচ্ছ হলেও যাজকের কাছে ঘটনাটা খুবই অলৌকিক মনে হল তাই তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে এ ব্যাপারে কিছু না ভেবে পারলেন না।

পরের রোববার ধর্মসংক্রান্ত আলোচনার পর যাজক পল্লীর সমস্ত অধিবাসীদের কাছে ঘটনাটা বিস্তৃতভাবে বললেন, এবং এ পৃথিবীর যিনি ত্রানকর্তা তার জন্য ওক কাঠের তৈরি ক্রুশের চেয়ে আরও সুন্দর আরও মূল্যবান একটা ক্রুশকাঠ বানানোর জন্য সবাইকে মুক্তহস্তে দান করার আহ্বান জানালেন। উপস্থিত সকলে এমন মহৎ কাজের জন্য অর্থদান করতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলো।

সেণ্ট ভ্যালেরির দরিদ্র জেলেরা তাদের সাধ্য মতো অর্থ দান করলো, বিধবারা নিয়ে এল তাদের বিয়ের আংটি। সমস্ত দান একত্রিত করে মঁসিয়ে ক্রফেম রওনা হয়ে গেলেন অ্যাবিভিলের উদ্দেশ্যে। সেখানে গিয়ে সুন্দর পালিশ করা আবলুস কাঠের একটা ক্রুশ বানিয়ে নেবার জন্য ফরমাস দিলেন। শুধু তাই নয় ক্রুশকাঠের গায়ে সোনার জল দিয়ে রীতিমত আলঙ্কারিক অক্ষরে আই-এন-আর আই লেখাটাও উৎকীর্ণ করা থাকবে। মাস দুয়েক পরে আগের সেই বেদীটির ওপর যিশুর মূর্তিটাকে আবার নতুন করে পেরেক দিয়ে বসানো হলো।

আবার পরের দিন ভোরে দেখা গেল সেই একই দৃশ্য—পালিশ করা আবলুস কাঠের ক্রুশ ছেড়ে যিশু পড়ে রয়েছেন বেদীর নিচে। কেন এমন ঘটনা বার বার ঘটছে তা জানার জন্য তিনি আগ্রহী হয়ে উঠলেন। এই অলৌকিক ঘটনা সত্যিই তাকে বিস্মিত করে তুলেছে।

তাই মঁসিয়ে লেকার তখন বহুক্ষণ ধরে সেই মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন। এই সময়ের মধ্যে সেই অলৌকিক কাহিনী আশেপাশের সব গ্রামগুলোতেই ছড়িয়ে পড়েছে। অ্যামিয়েন্সের মহিলারা সেণ্টভ্যালেরির যিশুর ক্রুশকাঠের জন্য চাঁদা তুললো। মঁসিয়ে ক্রফেম প্যারি থেকে পেলেন প্রচুর অর্থ আর গয়না। মেরিনের মন্ত্রীর স্ত্রী মাদাদ হাইদ দ্যা নুয়েভিল হীরক খচিত একটা মুকুট পাঠালেন। এই সমস্ত সম্পদ সঞ্চয় করে যে অর্থ পাওয়া গেল তা দিয়ে প্রায় দু'বছর ধরে লা রু সেণ্ট সালপিকের একজন কারিগর সোনা আর মূল্যবান সব পাথর দিয়ে দুর্লভ একটা ক্রুশ বানিয়ে দিল। সেই ক্রুশকে ইস্টারের পরে দ্বিতীয় রোববারে আবার অত্যন্ত নিষ্ঠা ও জাঁকজমক সহকারে সেণ্ট ভ্যালেরির গির্জায় প্রতিষ্ঠিত করা হলো। কিন্তু সারা জীবন ধরে যিনি দুঃখের ক্রুশকাঠ নিজের কাঁধে বয়ে বেড়িয়েছেন তাঁর এই স্বর্ণখচিত মহামূল্যবান ক্রুশও পছন্দ হলো না। পরের দিন যথারীতি দেখা গেল ক্রুশ যেখানে রাখা হয়েছিল সেইখানেই রয়েছে, আর যিশু পড়ে রয়েছেন বেদীর নিচে।

যদি উনি ক্ষুণ্ণ হন সেই ভয়ে যিশুকে ওখানেই রেখে দেওয়া হলো এবং বছর দুয়েকের বেশি উনি ওখানে একইভাবে পড়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ একদিন পীয়ের ক্যাইলোর হাবা ছেলেটা এসে মঁসিয়ে ক্রফেমকে খবর দিল যে সমুদ্রসৈকতে আমাদের প্রভু যিশুর ক্রুশটা পাওয়া গেছে।

অন্য কেউ হলে সেই হাবা ছেলেটার কথা বিশ্বাস করতো না, যেহেতু তার বুদ্ধিসুদ্ধি বলতে কিছু নেই, ভিক্ষে করে কোন রকমে দিন চালায়। তবে সে কখনও কারোর কোন ক্ষতি করেনা সেইজন্য কেউ তাকে অপছন্দ করেনা। ক্রফেম সমুদ্রে ভেসে আসা যিশুর কথা এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারেননি, তাই জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেটার কাছ থেকে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গির্জার কয়েকজন সহকারীকে নিয়ে সেই জায়গার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। সত্যিই তিনি সেখানে অনেকদিন আগে স্রোতে ভেসে আসা পেরেক দিয়ে গাঁথা দু'টুকরো কাঠের সন্ধান পেলেন, চেষ্টা করলে তা দিয়ে ক্রুশ বানিয়ে নেওয়া যায়।

অনেকেরই তখন বহুকাল আগে সেই ভয়ঙ্কর ঘূর্ণীঝড়ের কথা মনে পড়ে গেল, যখন সেণ্টভ্যালেরির অনেক জেলেই সেই দুর্যোগের মধ্যে পড়ে সমুদ্রে ডুবে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিল। স্রোতে ভেসে আসা ভাঙা দু'টুকরো কাঠের একটাতে কালো রঙ করা দুটো অক্ষর এখনও বেশ পরিস্কার পড়া যাচ্ছে—প্রথমটা জে-এবং অন্যটা এল। ওটা যে জঁা লেনোয়ালের নৌকার ভাঙা টুকরো তা অত্যন্ত সহজে বোঝা গেল, এই নৌকাতেই সে আর তার ছেলে দেজার সমুদ্রের বুকে ডুবে বছর তিনেক আগে মারা গিয়েছিল।

ভাঙা নৌকার কাঠদুটোকে ক্রুশকাঠ ভেবে নেওয়ার জন্য সেই হাবা ছেলেটার নির্বুদ্ধিতা প্রমাণিত হয়েছে ভেবে গির্জার সহকারীরা হাসাহাসি করলো। মঁসিয়ে ক্রফেম ওদের বিদ্রুপ করতে নিষেধ করলেন। তাঁর মনে হলো সমুদ্র-যিশু ডুবে যাওয়া সেইসব হতভাগ্য জেলেদের সঙ্গেই ছিলেন এবং ওদের মৃতদেহের সঙ্গে তাঁর

মূর্তিটাও সৈকতে ভেসে এসেছিল। যাজক তখন বালুকাবেলায় নতজানু হয়ে মৃত জেলেদের আত্মারশান্তি কামনা করে প্রার্থনা করলেন, তারপর সহকারীদের বললেন ভাঙা কাঠদুটোকে কাঁধে করে গির্জায় বয়ে নিয়ে যেতে।

বেদীর সামনে নিয়ে এসে কাঠ দুটোকে নামানো হলো, যাজক নিজের হাতে যিশুর মূর্তিটাকে বেদীর নিচে থেকে তুলে সেই ভাঙা কাঠের ওপর শুইয়ে দিলেন, তারপর নিজেই সমুদ্রের জলে মরচে ধরা পেরেক দিয়ে মূর্তিটাকে কাঠের গায়ে আটকে দিলেন।

যাজকের নির্দেশে পরের দিনই সোনা আর দুর্লভ পাথরের কারুকার্য করা ক্রুশের পরিবর্তে ভাঙা নৌকার অত্যন্ত সাধারণ কাঠের সঙ্গে আঁটা মূর্তিটাকে বেদীর ওপর স্থাপন করা হলো। কিন্তু এরপর আর যিশুর মূর্তিটা ক্রুশ থেকে খুলে নিচে পড়ে যায়নি। যে ভাঙা কাঠের টুকরোর ওপর শুয়ে সমুদ্রে ডুবে যাবার সময়েও বিশ্বস্ত মানুষটা তাঁকে আর তাঁর মা কুমারী মেরীকে স্মরণ করেছিল, সেই জীর্ণ কাঠের টুকরোতে মরচে ধরা পেরেক বিদ্ধ অবস্থাতেই তিনি যেন স্বেচ্ছায় ঝুলে থাকতে রাজি হলেন। যন্ত্রণা আর করুণা মেশানো অস্ফুট স্বরে তিনি যেন বলছেন, সমস্ত মানুষের দুঃখ দিয়ে গড়া আমার ক্রুশ বোঝার ভারে যারা ক্লান্ত আর নিঃস্ব আমি তাদেরই একান্ত আপন।

খুনীরা
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

হোটেলের লাঞ্চঘরের দরজা খুলতেই দু'জন লোক ঘরে ঢুকে কাউন্টারের কাছে বসল। জর্জ সঙ্গে সঙ্গেই তাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কি খাবেন? তাদের একজন উত্তর দিল, এখনই ঠিক বলতে পারছিনা, একটু পরে বলছি। সে তার সঙ্গীকে লক্ষ্য করে বলল, অল তুমি কি খাবে?

অল বলল, আমি জানি না। আমি যে কি খেতে চাই সেটাই আমার পক্ষে বলা মুশকিল।

বাইরে তখন অন্ধকার আরো গাঢ় হয়ে উঠছিল। রাস্তার আলো এসে পড়ছে জানালার উপর। আগন্তুক দু'জন তখন কাউন্টারের সামনে টাঙানো খাদ্য তালিকার ওপর অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে চোখ বোলাচ্ছে। কাউন্টারের অন্যদিকে নিক এ্যাডামস জর্জের সঙ্গে কথা বলছে।

প্রথম লোকটি বলল, আমাকে শুয়োরের মাংসের রোস্ট, আপেলের সস আর কিছু আলু সিদ্ধ দাও।

এগুলো এখন পাবেন না, কারণ এখনো তা তৈরি হয়নি।

খাদ্যতালিকায় সবকিছুই তো লেখা রয়েছে দেখলাম। লেখার আগে ভেবে দেখা উচিত ছিল।

জর্জ বলল, ওটা ডিনারের খাদ্যতালিকা। সন্ধা ছটার আগে আপনি চাইলেও আমরা দিতে পারবনা, এখন মাত্র পাঁচটা বাজে।

দ্বিতীয় লোকটা বলল, ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখো এখন পাঁচটা বেজে কুড়ি।

ঘড়িটা কুড়ি মিনিট ফাস্ট আছে।

প্রথম লোকটা বলল, শুধু কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই, এখন কি খাবার পাওয়া যাবে তাড়াতাড়ি বলো। দেরি করতে পারছিনা খুবই খিদে পেয়েছে।

জর্জ বলল, এখন যে কোন প্রকার স্যাণ্ডউইচ পাবেন।

শুধু স্যাণ্ডউইচ ওর পছন্দ নয়, তাই সে বলল আমাকে চিকেন ক্রকেট, মটরদানা ক্রীম সস আর আলুসিদ্ধ দাও।

আপনি যা যা চাইলেন সবগুলিই হচ্ছে ডিনারের খাবার।

ও রেগে গিয়ে বলল, যা চাইব তাই তোমাদের মত অনুযায়ী ডিনারের খাবার। এভাবে তোমরা কাজ করলে কাস্টমাররা এখানে আসবে কেন?

জর্জ ওকে ঠাণ্ডা করার জন্য বলল, আমি আপনাকে শুয়োরের মাংস আর ডিম দিতে পারি।

অল বলল, আমাকে তাই দাও। তার মাথায় ডার্বি টুপি, গায়ে কালো ওভারকোট, বুকের সব বোতামগুলো আঁটা। গলায় সিল্কের মাফলার আর হাতে দস্তানা। ঠোঁটদুটো চাপা, আর মুখটা ছোট।

অন্য লোকটি বলল, আমাকেও মাংস আর ডিম দাও।

ওদের দু'জনের উচ্চতা সমান। দু'জনে একই রকম পোষাক পরে এসেছে। ওরা পাশাপাশি গা ঘেঁষে টেবিলের ওপর কনুই রেখে বসে আছে।

অল জর্জকে বলল, আমাদের কিছু মদ দাও।

আপনারা কি নেবেন বলুন। আমাদের এখানে সিলভার বীয়ার, বেভো, জিঞ্জার এল প্রভৃতি মদ পাওয়া যায়। আপনাদের কোনটা পছন্দ?

তোমার যা মন চায় তাই দাও।

অলের সঙ্গী পিছনের দিকে তাকিয়ে নিককে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি?

আমার নাম এ্যাডামস।

অল তার সঙ্গী ম্যাক্সকে বলল, এই লাঞ্চঘরের ছেলেগুলো বেশ চটপটে, কত দ্রুত উপস্থিত সকলের ফরমাশ মেটাতে কাজ করছে।

ম্যাক্স বলল, শহরে এই ধরনের ছেলের কোন অভাব নেই।

এমন সময় রান্নাঘরের দরজা খুলে একজন নিগ্রো বেরিয়ে এসে

খাবার ঘরে ঢুকল।

কাউন্টারের ধারে বসে অল আর ম্যাক্স ওদিকেই তাকিয়ে বসে সবকিছু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল, নিগ্রোটিকে বলল, তুমি ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক নিগার।

নিগ্রোটির নাম সাম। এ্যাপ্রনপরা সাম উত্তর দিল, ঠিক আছে স্যার।

অল ম্যাক্সকে বলল, আমি এ্যাডামস আর সামকে নিয়ে রান্নাঘরে যাচ্ছি।

ওরা রান্নাঘরে গেলে ম্যাক্স আর জর্জ কাউন্টারের কাছে রয়ে গেল। জর্জ এই ঘটনার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। অবাক দৃষ্টিতে ম্যাক্সের দিকে তাকিয়ে আছে। ম্যাক্স তখন আয়নার দিকে তাকিয়ে জর্জকে লক্ষ্য করল তার চোখেমুখে এমন কোন পরিবর্তন ঘটেছে কিনা যা সহজে ধরা পড়ে। জর্জ কিছুটা ঘাবড়ে গেছে বুঝতে পারল ম্যাক্স, তাই জিজ্ঞেস করল, তুমি কিছু বলছ না কেন জর্জ?

জর্জ বলল, এসব কি হচ্ছে? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

ম্যাক্স একই জায়গায় দাঁড়িয়ে হেড়ে গলায় বলল, অল শোন, জর্জ জানতে চাইছে এসব কি হচ্ছে।

অল রান্নাঘর থেকেই উত্তর দিল, তুমি ওকে বুঝিয়ে বলছ না কেন?

ম্যাক্স আবার আয়নার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কি মনে হচ্ছে? তুমি কি কিছুই বুঝতে পারছ না কি ঘটতে চলেছে?

আমি জানি না, আমি কিছু বলতে পারব না।

ম্যাক্স তেমনি হেঁকে বলল, অল শুনছো জর্জ বলছে ওর কি মনে হচ্ছে তা ও বলতে পারবে না।

অল রান্নাঘর থেকে উত্তর দিল, আমি সব শুনতে পাচ্ছি। জর্জ তুমি কাউন্টার থেকে একটু দূরে ডানদিকে সরে দাঁড়াও, আর মাক্স বাঁদিকে দাঁড়াও।

ম্যাক্স আবার জর্জের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে। তুমি চুপচাপ থাকতে পারবে না, আমার সঙ্গে কথা তোমাকে বলতেই হবে ছোকরা।

কি ঘটনা ঘটতে চলেছে বলে তোমার মনে হয় ?

জর্জ কোন উত্তর দিল না।

ওর কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে বলল, তুমি যখন কোন কথাই বলবে না ঠিক করেছো তবে আমার কাছ থেকেই শোন। আমরা একজন সুইডিসকে খুন করবো বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি নিশ্চয়ই ওল এ্যাণ্ডারসন নামে মোটা সুইডিসটাকে চেন ?

জর্জ খুনের কথা শুনে শিউরে উঠেছে, তবু উত্তর দিল হাঁ চিনি।

লোকটা এখানে প্রতিদিন নৈশ ভোজন করতে আসে আমরা জানি, ঠিক বলেছি তো ?

প্রতিদিন না হলেও মাঝে মাঝে আসে।

সে এলে ছ'টার সময় আসে তাই না ?

হ্যাঁ। ঘড়িতে ছটা বাজলেই ও এসে উপস্থিত হয়।

ম্যাক্স বলল, আমাদের কাছে সব খবরই আসে। আমরা জেনেশুনেই তবে এখানে এসেছি।

যাইহোক আমাদের প্রয়োজনীয় কথা শেষ হয়ে গেছে এবার তোমার সঙ্গে অন্য কথা বলি। তুমি কি সিনেমা দেখ ?

খুব কম দেখি।

কম দেখ কেন ? আরো বেশি সিনেমা দেখবে। তোমাদের মতো ছোকরার প্রায়ই সিনেমা দেখা উচিত।

কিন্তু জর্জ খুনের ব্যাপারটা নিয়ে বেশি চিন্তা করছে, তাই সে জিজ্ঞেস করল, তোমরা ওল এ্যাণ্ডারসনকে খুন করতে চাইছ কেন ? ওকি তোমাদের কোন ক্ষতি করেছে ?

করার কোন সুযোগ পায়নি, সে আমদের চেনে না, এমনকি এখনও পর্যন্ত সে আমাদের দেখেনি।

অল রান্নাঘর থেকে বলল, আজই সে আমাদের প্রথম দেখবে।

যে তোমাদের চেনে না, তোমাদের কোন ক্ষতি করে নি, তবে কেন তাকে তোমরা খুন করতে চাইছ ?

আমাদের এক বন্ধুর নির্দেশে আমরা তাকে খুন করতে চাই।

অল রান্নাঘর থেকে ম্যাক্সকে ধমকে উঠে বলল, এবার চুপ করো। খুব বেশি কথা বলে ফেলেছ। আমরা কেন এবং কাকে খুন করতে চাই তা ওকে বিস্তৃতভাবে জানাবার কি প্রয়োজন ?

ম্যাক্স বলল, আমি ছেলেটাকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করছি।

জর্জ ঘড়ির দিকে তাকাল, ছটা বাজতে আর বেশি দেরি নেই। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো তুলকালাম কাণ্ড বেধে যাবে।

ম্যাক্স জর্জকে বলল, এখন যদি কেউ আসে বলবে রাঁধুনি নেই, কোন খাবার পাওয়া যাবে না। বলবে রাঁধুনি না এলে তোমাকেই রান্না করতে হবে।

জর্জ বলল, ঠিক আছে। কিন্তু তারপর আমাদের কি করতে হবে ?

সেটা এখনই বলা যাবে না, অবস্থা অনুযায়ী দেখতে হবে তোমাদের কি করা প্রয়োজন।

জর্জ আবার ঘড়ির দিকে তাকাল। ছটা বেজে পনের। হোটেলের সামনে একটা মোটর গাড়ি এসে থামল। ড্রাইভার এসে বলল, হ্যালো জর্জ রাতের খাবার কি পাওয়া যাবে ?

জর্জ নির্দেশমতো বলল, রাঁধুনি সাম বাইরে গেছে, আধঘণ্টা বাদে আসবে।

অতক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব নয়, তাই চলে যাচ্ছি।

ড্রাইভার চলে যেতে জর্জ আবার ঘড়ির দিকে তাকাল, ছ'টা বেজে কুড়ি।

ম্যাক্স ধন্যবাদ জানালো জর্জকে যেহেতু সে নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

অল রান্নাঘর থেকে বলল, কিছুমাত্র বেগড়বাই করলে যে আমি ওর মাথাটা উড়িয়ে দেব তা ও ভাল করেই জানে।

ম্যাক্স বলল না, না তেমন কোন ব্যাপার নয়. আসলে জর্জ খুবই ভাল ছেলে, ওর মাথায় বেশ বুদ্ধি আছে।

ছটা বেজে পঁচিশ, জর্জ বলল, অন্যদিন এই সময়ে সে এসে পড়ে

এখনও পর্যন্ত যখন আসে নি, তাহলে আজ সে আর আসবে না।

এমন সময় দু'জন খরিদ্দার এল হোটেলে। জর্জ তাদের অপেক্ষা করতে বলে নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে স্যাণ্ডউইচ ভেজে নিয়ে এল। খরিদ্দার দাম দিয়ে স্যাণ্ডউইচ নিয়ে চলে গেল।

ম্যাক্স বলল, ছেলেটা দেখছি অনেক কাজের। রান্না ছাড়াও সব রকম কাজ করতে পারে।

হ্যাঁ, আমাকে প্রায়াজন হলে সব কাজই করতে হয়, তাই কাজ শিখে রাখা ভাল। কিন্তু আমি ভাবছি তোমার বন্ধু ওল অ্যাণ্ডারসেন আজ কেন এলেন না।

আর দশ মিনিট আমরা ওর জন্য অপেক্ষা করব, এই বলে ম্যাক্স একবার আয়নার দিকে তারপর ঘড়ির দিকে তাকাল। ঘড়িতে তখন সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট।

দশ মিনিট অপেক্ষা করার পরও তার দেখা মিললনা। তবে আজ আর ও এখানে আসছে না।

ম্যাক্স বলল, রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এস অল, আমরা চলে যাই আর অপেক্ষা করে কোন লাভ নেই, আজ ও আসবে না।

রান্নাঘর থেকে অল উত্তর দিল আরও পাঁচ মিনিট দেখো।

এমন সময় একজন লোক এল হোটেলে। জর্জ বলল রাঁধুনির অসুখ করেছে, তাই আজ আমি আপনাকে কিছুই দিতে পারছিনা।

লোকটা বলল, একজন রাঁধুনির ওপর নির্ভর করে থাকলে চলবে? অন্য রাঁধুনি রান্নার ব্যবস্থা করনি কেন? এভাবে কি লাঞ্চ কাউন্টার চালানো সম্ভব? লোকটা এই কথা বলে চলে গেল।

ম্যাক্স আবার বলল, আর দেরি না করে চলে এস অল, এ্যাডামস আর নিগ্রোটার খবর কি?

ওরা সব ঠিকই আছে। আমি ওদের ব্যবস্থা করে রেখেছি।

রান্নাঘর থেকে অল বেরিয়ে এসে ম্যাক্সকে বলল, তুমি এত বেশী কথা বল কেন? প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলা আমি পছন্দ করি না।

অলের কোমরের কাছে শটগানটা সবাই দেখতে পাচ্ছিল। অল জর্জকে বলল, তুমি আমাদের নির্দেশ মত ভালই কাজ করেছ। তোমার ভাগ্যটাও খুব ভাল।

অল ও ম্যাক্স এবার হোটেল থেকে বেরিয়ে গেল। জর্জ তাড়াতাড়ি জানালার সামনে ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখল ওরা দুজনে রাস্তা পার হয়ে বেশ কিছুটা দূরে চলে গেছে। ও নিশ্চিন্ত হয়ে রান্না ঘরে ঢুকে এ্যাডামস আর রাঁধুনির বাঁধন খুলে দিল। অল ওদের বেঁধে রেখে ছিল। এ্যাডামসের চোখমুখ এমনভাবে তোয়ালে দিয়ে বাঁধা ছিল যাতে সে কিছুই দেখতে না পায়। হাতদুটোও শক্ত করে বাঁধা ছিল।

বাঁধন খুলে দিতেই এ্যাডামস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কি জুলুম দেখ, আমাদের ভয় দেখিয়ে রান্না ঘরে আটকে রেখেছিল!

জর্জ বলল, ওরা ওল এ্যাণ্ডারসনকে খুন করতে এখানে এসেছিল। সে এখানে খেতে এলেই গুলি করত।

ওল এ্যাণ্ডারসনকে ওরা খুন করবে কেন?

জানি না।

রাঁধুনি সাম বলল, ওরা কি চলে গেছে?

হ্যাঁ, ওরা চলে গেছে দেখেই তোমাদের মুক্ত করতে সাহস পেয়েছি।

এ সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়াতে আমাদের মোটেই ভাল লাগে না।

জর্জ এ্যাডামসকে বলল, তুমি এ্যাণ্ডারসনের বাড়ি গিয়ে বলে এস ও যেন খুব সাবধানে চলাফেরা করে। যেকোন মুহূর্তে বিপদের মুখোমুখি হতে পারে।

ঠিক আছে। ওকে বিপদ থেকে রক্ষা করা উচিত।

সাম এ্যাডামসকে বলল, এ ব্যাপার থেকে তোমার দূরে সরে থাকাই ভাল। একজনকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে না জড়িয়ে পড়।

জর্জ বলল, যদি তোমার মন না চায় তবে তুমি ওর বাড়ি যাবে না।

সাম বলল, এ ব্যাপারের সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলে লাভ

কি ? দূরে থাকাই ভাল, যে যা খুশী করুক।

এ্যাডামস সামের সঙ্গে একমত হতে পারে নি, বলল, আমি যাব এ্যাণ্ডারসনের কাছে।

তুমি কি তার বাড়ির ঠিকানা জান ?

জর্জ এ্যাডামসকে তার বাড়ির ঠিকানা দিল।

আমি নিশ্চয়ই যাব, বলে এ্যাডামস হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলল। এ্যাণ্ডারসনের বাড়ির দিকে। ওর বাড়িতে পৌঁছে দরজায় কলিং বেল বাজাল। একজন মহিলা দরজা খুললেন।

এ্যাডামস বলল, ওল এ্যাণ্ডারসন কি বাড়িতে আছেন ?

আপনি তার সঙ্গে দেখা করতে চান ?

হ্যাঁ, অবশ্য তিনি যদি বাড়িতে থাকেন।

ভেতরে আসুন।

এ্যাডামস ভদ্রমহিলার সঙ্গে দোতলায় উঠে গেল। একটা ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ঠেলা দিয়ে দেখল দরজা বন্ধ। তাই দরজায় কড়া নাড়ল। ঘরের ভেতর একজন জিজ্ঞেস করল, কে ?

মহিলাটি বলল, একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন এ্যাণ্ডারসন। ভদ্রলোকের নাম নিবেন এ্যাডামস।

ওনাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

এ্যাডামস দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। এ্যাণ্ডারসন চাদর মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। তাকে অসময়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে অবাক হল। সে এ্যাডামসের দিকে না তাকিয়ে বলল, কি ব্যাপার ? আপনি এখানে কি জন্য এসেছেন বলুন।

এ্যাডামস বলল, আমি হেনরির হোটেলে ছিলাম। দুজন অপরিচিত লোক এসে আমাকে এবং রাঁধুনি সামকে রান্নাঘরের ভেতর ঢুকিয়ে বেঁধে রাখল। ওরা বলল, তোমার খোঁজেই ওরা এসেছে। তুমি হোটেলে খেতে গেলে তোমাকে খুন করবে।

কথাটা শুনেও এ্যাণ্ডারসনকে এতটুকু বিচলিত মনে হল না, কিছুই

বলল না। চুপচাপ শুয়ে রইল।

এ্যাডামস ভাবল কথাটা হয়তো ঠিকমতো বুঝতে পারেনি, আবার বলল, ওরা এসে আমাদের রান্নাঘরে বেঁধে রাখে। তুমি হোটেলে নৈশ ভোজন করতে গেলেই ওরা তোমাকে গুলি করত।

এ্যাণ্ডারসন সব শুনেও কিছু না বলে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। ওকে খুন করার জন্য দুজন লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, একথা জেনেও বিন্দু মাত্র ঘাবড়াতে না দেখে অবাক হল এ্যাডামস। ও বলল, জর্জ তোমাকে খবরটা দেওয়ার জন্য আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। এ্যাণ্ডারসন বলল, আমি 'এব্যাপারে কিছুই করতে পারি না। আমাকে কেউ খুন করতে চাইলে আমি কি করব বুঝতে পারছি না।

ওরা দেখতে কেমন তা আমি তোমাকে বলতে পারি যাতে কোথাও ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সাবধান হয়ে যেতে পারো।

তা আমি জানতে চাই না। আসলে আমার কিছুই করার নেই। তুমি যে আমার বিপদের কথা জেনে আমাকে সাবধান করতে এসেছ এর জন্য ধন্যবাদ।

তবে কি আমি পুলিশকে সব জানিয়ে দেব ? ওরা তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।

কোন লাভ নেই, তাতে কোন ফল হবে না। হয়তো মিথ্যে করে ওরা কথাটা রটিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

না, কোনটাই মিথ্যে নয়। ওরা যা করছে তা মিথ্যে হতে পারে না।

এ্যাণ্ডারসন বিছানায় পাশ ফিরে শুয়ে বলল, আমি শুধু একটা কাজই করতে পারি, আজ আমি আর বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাও যাব না।

তুমি এই শহর থেকে দূরে কোথাও চলে যেতে পার না যাতে ওদের সঙ্গে তোমার কোথাও দেখা না হয় ?

এ্যাণ্ডারসন বড্ড বেশী নির্বিকার, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল আমার চারপাশে কত ষড়যন্ত্র চলছে আমি তার কিছুই জানিনা।

যাই ঘটুক, কিন্তু আমার কিছু করার নেই।

এমনভাবে সবকিছু মেনে নিলে চলবে না। কোন একটা উপায় খুঁজে বার করার চেষ্টা করছ না কেন?

এখন কিছুই আর করার নেই, একটু পরে চিন্তা করে দেখব সত্যি সত্যিই আজ বাড়ীর বাইরে যাওয়া উচিত হবে কিনা।

অ্যাডামস বলল, আমি তাহলে হোটেলে ফিরে যাই।

হ্যাঁ, নিশ্চিন্ত মনে চলে যেতে পার, এখানে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ। অ্যাডামস ঘর থেকে বেরোবার সময় লক্ষ্য করল অ্যাণ্ডারসন চাদর চাপা দিয়ে চুপ করে শুয়ে আছে। সিঁড়ি দিয়ে সে আস্তে আস্তে নীচের তলায় নেমে এল। বাড়ীওয়ালী তাকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে বলল, সারাদিন ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে আছে অ্যাণ্ডারসন। আজ বোধহয় শরীরটা ভাল নেই। আমি তাকে কতবার বললাম বাইরে একটু বেড়িয়ে আসতে, কিন্তু আমার কথা শুনল না। লোকটা অবশ্য খুবই ভাল।

আমি তা জানি, ওর সঙ্গে আমার পরিচয় অনেকদিনের।

ভদ্রমহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এল অ্যাডামস। রাস্তাটা বেশ অন্ধকার, শুধু মাঝে মাঝে লাইটপোষ্টের ডুমগুলো টিমটিম করে জ্বলছে। সে হোটেলে ফিরে আসতেই জর্জ জিজ্ঞেস করল, দেখা হয়েছে অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে?

হ্যাঁ, ও সারাদিন ধরে ঘরেই আছে। আজ আর বাড়ীর বাইরে যায়নি একবারের জন্য। হয়তো শরীর ভাল নেই।

ওকে সব কথা জানিয়েছ?

সবকিছু জানানো সত্ত্বেও ওর মধ্যে কোন পরিবর্ত্তন দেখতে পেলাম না। তবে ও হয়তো আগে থেকেই সবকিছু জানে।

এই চক্রান্তের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য ও কি কিছু করছে?

কিছুই না।

তাহলে ওরা ওকে খুন করবে।

আমারও তাই মনে হয়। কিন্তু সবচেয়ে অবাক কাণ্ড আগে খবর পেয়েও নিজেকে বাঁচানোর কোন চেষ্টা করছে না।

অ্যাণ্ডারসন নিশ্চয়ই শিকাগোর কোন ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।

অ্যাডামস বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছে। ব্যাপারটা সত্যিই ভয়ঙ্কর।

জর্জ একটা তোয়ালে দিয়ে কাউন্টারটা মুছতে মুছতে বলল, ব্যাপারটা আসলে যে কি সে সম্বন্ধে ওরাও তো কিছু বলল না।

বুঝতে পারছি না ওকি এমন সাংঘাতিক কাজ করেছে যে ওকে খুন করার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে?

ওদের কোন বন্ধুর নিশ্চয়ই ও এমন কিছু ক্ষতি করেছে যার জন্য ওরা ওকে খুন করবে।

অ্যাডামস বলল, এই শহর ছেড়ে আমি চলে যাব, এখানে থাকতে আমার মন চাইছে না। এমন একটা বিশ্রী ঘটনা সামনে দাঁড়িয়ে দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জর্জ বলল, সেই ভাল। তুমি তো চলে গিয়ে বাঁচবে। কিন্তু আমার কি হবে? ওরা আমার ঘরে এসে অ্যাণ্ডারসনের জন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করবে, একদিন হঠাৎ হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাবে, তারপর! তারপর কি হবে আমার ভাবতে মোটেই ভাল লাগছে না। কিন্তু তুমি তখন নিশ্চিন্তে দূরে থাকবে, তোমাকে এই ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হবে না।

ছোটবেলার দুঃখ
টমাস মান

ডিনার টেবিলে খেতে বসেছে সকলে আর বালকভৃত্য জেভার তাদের পরিবেশন করতে ব্যস্ত। এমনসময় ইনগ্রিড ও বার্ট তাদের বাবাকে মনে করিয়ে দিল আজ বাড়িতে অতিথিরা আসবে। ওদের বাবা কর্ণেলিয়াস ইতিহাসের অধ্যাপক। অধ্যাপনার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে ভালবাসেন, খুবই আপনভোলা মানুষ। পড়াশুনা ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে মনোযোগ দিতে চান না, ফলে নিজের প্রয়োজনীয় ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছু মনে রাখতে পারেন না। তাঁর এই ভুলোমনের জন্য ছেলেমেয়েরা সবসময় তাঁকে সাহায্য করে যাতে তিনি কোন সময়ে অদ্ভুত পরিস্থিতির মুখোমুখি না হন।

ইনগ্রিড আঠারো বছরের কিশোরী তার চোখদুটো বাদামী। মুখটি সবসময় হাসিখুশিতে ভরা। লেখাপড়ায় খুবই অমনোযোগী। সামনে পরীক্ষা। কিন্তু পড়াশুনা বা পরীক্ষায় পাশ করার ব্যাপারে তার কোন মাথাব্যথা নেই। দিনরাত বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈ চৈ করে বেড়াচ্ছে। তার একমাত্র স্বপ্ন মঞ্চের অভিনেত্রী হওয়া। কোনমতে মঞ্চে অভিনয় করার সুযোগ পেলেই সে যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে যাবে। তবে তার পছন্দ হাস্যরসিকের ভূমিকায় অভিনয় করার।

বার্টের বয়স এখন সতের। চেহারা মোটামুটি সুন্দর। লেখাপড়া করে ভালো ক্যারিয়ার তৈরি করার কথা সে কখনই ভাবে না। কোনরকমে স্কুলের পড়াটা শেষ করতে পারলেই সে বেঁচে যায়। তার একমাত্র ঝোঁক অভিনয়ে নাম করতে পারা। যদি সে সুযোগ কপালে না জোটে তবে 'কায়রো' নামে রেষ্টুরেন্টটায় পরিচারকের কাজটা পেয়ে গেলেই সন্তুষ্ট।

বার্ট ও জেভার প্রায় সমবয়সী এবং দুজনকে অনেকটা একই রকম দেখতে। তবে বার্টের চেহারার সঙ্গে আশ্চর্য মিল আছে তার বাবার। অধ্যাপক কর্ণেলিয়াস অনেকসময় তাঁর ছেলে বার্ট আর জেভারের

মধ্যে পার্থক্যটা একেবারে ভুলে যান। জেভার তাঁদের ভৃত্য হলেও তাকে অবজ্ঞা করতে পারেন না, নিজের ছেলের মতোই তাকে ভালোবাসেন, এবং তার সঙ্গে এমনভাবে কথাবার্তা বলেন যেন সে এই পরিবারের একজন।

ইনগ্রিড আর বার্ট ছাড়াও অধ্যাপক কর্ণেলিয়াসের আরো ছুটি ছেলেমেয়ে আছে, তাদের নাম এলিনর ও স্নাপার। তাদের বয়স কম বলে তারা তাদের মায়ের কাছে বেশি থাকে। তাদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব দেওয়া আছে নারীভৃত্য এ্যানের ওপর। ওরা ওপর তলাতে থাকে এবং সেখানেই এ্যান তাদের খাওয়ায়, তাই ওদের খাবার সময় নীচে নামার প্রয়োজন হয় না। মেয়ে এলিনরের বয়স পাঁচ বছর, সে মায়ের মতো তার বাবাকে 'আবেল' বলে ডাকে। মেয়ের মুখে এই ডাক শুনতে খুব ভালোবাসেন অধ্যাপক কর্ণেলিয়াস। তার শিশু বয়সের যে ছবিটা এখন পাওয়া যায় তার সঙ্গে এলিনরের চেহারাটা হুবহু মিলে যায়। তিনি ছেলেমেয়েদের মধ্যে এলিনরকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। তার দুষ্টু মুখের হাসির কোন তুলনা নেই।

ইনগ্রিডের খাওয়া প্রায় শেষ। টেবিল থেকে উঠে যাবার আগে ভাবল, বাবা, মা নিশ্চয়ই কথাটার ওপর তেমন গুরুত্ব দেন নি। তাই আবার মনে করিয়ে দেবার জন্য বলল, তোমরা হয়তো ভুলে যাওনি যে আজ আমাদের বাড়ীতে অতিথি আসার কথা। তারা বেশীক্ষণ অবশ্য এখানে থাকবে না। রাত নটার মধ্যেই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে।

কর্ণেলিয়াসের মুখখানা কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেল। বাড়ীতে অনেক মানুষের ভীড় আর হট্টগোল তিনি ঠিক মন থেকে মেনে নিতে পারেন না। তবুও আপত্তি করতে দ্বিধা বোধ করেন। অবাক হয়ে বললেন, ওঃ তাই না কি! আমার একেবারেই খেয়াল ছিল না যে যে আজকেই সেই দিনটা। হাঁ মনে পড়েছে আজই তো বৃহস্পতিবার খুব ভালো কথা, তবে ওরা আসছে কখন?

ইনগ্রিড বলল, ওদের আসতে আসতে প্রায় বেলা চারটে সাড়ে চারটে হয়ে যাবে। কর্ণেলিয়াস, বললেন না, না, তা কিভাবে সম্ভব ? চারটে থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত চলবে তোমাদের হৈ চৈ ? কিন্তু আজ তো এতসময় তোমাদের আমি দিতে পারব না। তখন বার্ট বলল ওয়াঙ্গা অন্যদিন একেবারেই সময় পায় না। ওকে নাটকে অভিনয় করতে হয়। অন্যদিন এলে ওকে সাড়ে ছটার মধ্যেই চলে যেতে হবে।

ওয়াঙ্গার আসল নাম আইভান হার্জেল। স্ট্যাভ থিয়েটারে অভিনয় করে সে বেশ নাম করেছে। অনেকেই ওকে চেনে এবং ওর অভিনয় নিয়ে কোথাও আলোচনা হলে ওর কপালে বেশীর ভাগ সময়ে প্রশংসাই জোটে। হার্জেল তাই নিজেকে সকলের থেকে একটু আলাদা বলে মনে করে। তার ভক্তের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। ইউগ্রিড আর বার্ট তার ভক্তদের তালিকায় প্রথম দিকে আছে। তারা প্রায়ই থিয়েটারের সাজঘরে গিয়ে হার্জেলের সঙ্গে দেখা করে। এতে সে একটুও বিরক্ত হয় না, বরঞ্চ মনে মনে খুশীই হয়। অন্য অভিনেতারা অন্ততঃ চেয়ে দেখুক তার ভক্তরা তার সঙ্গে দেখা করার জন্য কত আগ্রহী। কর্ণেলিয়াস কিন্তু এ ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দিতে চান না, তার কাছে এসব অবান্তর ছেলেমানুষি বলে মনে হয়। বার্টের অভিনেতা হবার শখ সবসময় চেষ্টা করে চলাফেরা কথাবার্তায় হার্জেলকে অনুকরণ করতে, ফলে তার সম্পূর্ণ প্রভাব পড়েছে বার্টের ওপর।

কর্ণেলিয়াস ছেলেমেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, হার্জেল ছাড়া আর কে কে এ বাড়ীতে আজ আসছে ? ইনগ্রিড মুখস্থ বলার মতো একে একে নামগুলো বলে গেল। এদের মধ্যে স্কুলের বন্ধু বান্ধবও আছে। নামশুনে কাউকেই তিনি চিনতে পারলেন না।

ঘন ঘন টেলিফোন আসতে শুরু করেছে। সকলে জেনে নিতে চায় ঠিক কখন আসতে হবে। আর যাদের আসার কথা তারা সকলে ঠিকমতো আসছে তো। ইনগ্রিড আর বার্ট ছুটে গিয়ে

টেলিফোন ধরছে। ওরা বেশ ফুর্তিতেই আছে, বারবার টেলিফোন ধরতে ছোটাছুটি করতে হলেও এতটুকু পরিশ্রান্ত হয় না। টেলিফোনটা ওদের কাছে খুব মজার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং ওদের আনন্দের উৎস।

ইনগ্রিডকে অনেকটা ঠিক তার মায়ের মতো দেখতে হয়েছে। তবে অতটা লম্বা নয়। চেহারাটা আগে খুব খারাপ ছিল না, কিন্তু এখন ঘরসংসারের কাজ নিয়ে খুবই ব্যস্ত থাকতে হয় বলে শরীরের যত্ন নিতে পারেন না, তাই একটু ম্লান আর রোগা রোগা দেখায়।

ছোট ছেলেমেয়ে দুটি দেখতে হয়েছে প্রায় একই রকম। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন যমজ। তারা আবার একই ধরনের পোশাক পরতে ভালবাসে। বাইরের দিক থেকে দেখলে যতই দুজনের মধ্যে মিল দেখা যাক না কেন মন মেজাজের দিক থেকে দুজনেই সম্পূর্ণ আলাদা। মেয়ে এলিনর বয়সে কিছু বড় কিন্তু খুবই শান্ত আর নম্র প্রকৃতির। অন্যদিকে মাত্র চার বছর বয়সেই স্ন্যাপার হয়ে উঠেছে উগ্র প্রকৃতির। পান থেকে চুন খসলেই রেগে অস্থির আর সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করে কান্না। তাকে সামলাতে সকলে হিমসিম খেয়ে যায়।

এলিনর বাবাকে বেশি ভালবাসে। কর্ণেলিয়াসও তার ছেলেমেয়েদের মধ্যে ওদের বেশি স্নেহ করেন। এদিকে স্ন্যাপার তার মাকে বেশি ভালবাসে। কারণ তার সব আদর মেটাতে মা সবসময় চেষ্টা করেন। মাও সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে ওকেই বেশি পছন্দ করেন। এলিনরকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে কর্ণেলিয়াস ভাবলেন স্ন্যাপারের প্রতি তার স্ত্রীর নজর বেশি। সবাইকে সমান চোখে দেখা উচিত এমন ভাবতে গিয়ে নিজেরই কেমন যেন খটকা লাগলো। এলিনরের প্রতি তার ভালবাসাটাও নেহাত কম নয়। উইমেন্স হসপিটালে এলিনর জন্মেছে। ওর ভূমিষ্ঠ হবার খবর আসতেই ছুটে গিয়েছিলেন হাসপাতালে। ওকে প্রথম দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সমস্ত মনের মধ্যে এক শান্ত অনুভূতি স্থান করে নিল, মুহূর্তের মধ্যে এলিনর

মনের সমস্ত অংশটা দখল করে নিয়েছিল। তার বড় বড় চোখছুটোকে আকাশের চেয়ে বেশি নীল আর সূর্যালোকের থেকে অনেক উজ্জ্বল বলে মনে হয়।

এক একদিন নদীর ধারে একা বসে পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের রঙের খেলা দেখতে দেখতে ভেবেছেন এলিনরের প্রতি তাঁর এই অতিরিক্ত স্নেহানুভূতির কথা। তিনি একই উত্তর পেয়েছেন বারবার—যে অতীত মৃত সেই মৃত অতীতকে উনি যেন জীবন্ত দেখতে চান তাঁর শিশুকন্যার মধ্যে। এতে শুধু অনন্তচেতনা সময়ের গণ্ডীকে অতিক্রম করে মূর্ত হয়ে থাকতে পারে। এলিনরকে কোলে নিয়ে এইসব কথাই ভাবছেন কর্ণেলিয়াস। এলিনর বাবার আদর খেতে খেতে খুব গর্ব নিয়ে মায়ের দিকে তাকাচ্ছিল বারবার। স্ল্যাপার তখন বসে আছে মায়ের কোলে। ছুজনে বাবা আর মাকে ভাগাভাগি করে নিয়েছে তাই কেউ ক্ষুব্ধ নয়।

অন্যদিন ছুপুরবেলায় এলিনর আর স্লাপার সারা বাড়ি জুড়ে ছুটোছুটি করে বেড়ায়, কত খেলা করে আবার কখনও ছড়া পড়ে। গোটা বাড়ীটা হাসি খুশীতে ভরিয়ে রাখে। গোটা বাড়ীটাকে যারা মাতিয়ে রাখতে পারে তারা আজ খুব শান্ত হয়ে একজন বাবার কোলে একজন মায়ের কোলে আশ্রয় নিয়েছে। আজ তাদের ছুষ্টুমি করে বেড়াবার কোন সুযোগ নেই। বাড়ীতে আজ অনেক লোকজন আসবে, তারা খাওয়া-দাওয়া করবে। সকলেই সেই ব্যাপার নিয়ে বেশি ভাবছে।

কর্ণেলিয়াস আর সময় নষ্ট করতে চাইলেন না, উনি উপরতলায় তাঁর পড়ার ঘরে চলে গেলেন। আগামীকাল এক অদ্ভুত বিষয় নিয়ে বক্তৃতা করতে হবে, তাই নিজেকে তৈরি করে নেবার কথা ভেবে সে বিষয়ে পড়াশুনা শুরু করলেন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে। চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছেন, জ্বলন্ত সিগারটটা বাঁ হাতের ছুটো আঙুলের ফাঁকে নিয়ে তিনি একমনে বই পড়ে চলেছেন। স্ত্রী চলে গেলেন বাজারে, অতিথিদের জন্য দেখেশুনে ভালো জিনিষ আনতে হবে যাতে

আপ্যায়নে কোন ত্রুটি না ঘটে। ইনগ্রিড আর বার্ট বেরিয়েছে অতিথিদের মধ্যে যাদের পাওয়া যায় তাদের ডেকে আনতে।

বিকেলের দিকে কর্ণেলিয়াস তাঁর পড়ার ঘরে বসেই শুনতে পেলেন অতিথিদের হাসি আর কথাবার্তা, বুঝলেন একে একে ওরা আসতে শুরু করেছে। সন্ধ্যা হতেই অতিথিদের চা দিয়ে আপ্যায়িত করা হল। একটু পরেই হলঘরে নাচের আসর বসবে। মলার ও খ্যাতিমান অভিনেতা হার্জেল আসার সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত সকলে দাঁড়িয়ে উঠে অভিবাদন জানালো। ঘরের মধ্যে হঠাৎ যেন নতুন প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠেছে।

কর্ণেলিয়াস ভাবলেন আর পড়ার ঘরে বসে থাকা ঠিক হবে না। উনি মুখহাত ধুয়ে নিচে নেমে এলেন অতিথিদের সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। অতিথিরা বেশির ভাগই কম বয়সী। তাই ওদের মধ্যে থাকতে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কিন্তু ঘর থেকে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে প্রত্যেক অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, আজ আমার বাড়ীতে তোমরা আসায় আমি খুব আনন্দিত হয়েছি। ইনগ্রিড বিশেষ করে তার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী সুন্দরী ফ্রলিন প্লেশিঙ্গার ও বন্ধু হের জুবের আর হের হার্গেসেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল তার বাবার।

অভ্যর্থনার পর্ব চুকে গেলে নাচের আসর শুরু হলো। নাচের আসর উদ্বোধন করল মলার স্পেনের লোকগীতি গেয়ে। একটি গান গেয়ে সে থেমে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু উপস্থিত সকলের অনুরোধে আরো কয়েকটি গান গেয়ে শোনালো। তারপর ওরা ডন কার্লো নামে একটি গীতিনাট্য মঞ্চস্থ করল। অভিনেতা হার্জেল তাতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে সকলের প্রশংসা কুড়িয়ে নিল।

লোকগীতির প্রতি কর্ণেলিয়াসের বেশ দুর্বলতা আছে। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগীতি সংগ্রহ করা ও মন দিয়ে তা শোনার অভ্যেস তাঁর আছে। তাই তিনি স্পেনের লোকগীতির অনুষ্ঠানটা খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন।

কিন্তু আর বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। তিনি অন্যদিনের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, নদীর ধারে নির্জন পথ ধরে বেড়াতে তার ভাল লাগে। আজ বেশীক্ষণ থাকেননি, খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন। সাড়ে আটটার সময় অতিথিদের ইতালিয়ান স্যালাড খেতে দেওয়া হবে।

জেভার আজকে সাদা কোট পরেছে। মাথার চুল নাড়িয়ে সব কাজকর্ম দেখাশোনা করতে ব্যস্ত।

কর্ণেলিয়াস নিচের তলায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন কয়েকজন অতিথিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ব্যস্ত তখন জেভার দ্রুত কাছে এসে বলল, আপনি তাড়াতাড়ি উপরে যান এলি খুব কাঁদছে, কেউ তাকে শান্ত করতে পারছে না। কেউ কোলে তুলে কান্না থামাতে গেলেই আরো চিৎকার করছে।

কর্ণেলিয়াস মেয়ের এই অবস্থার কথা শুনে খুবই উদ্বিগ্ন হলেন, প্রশ্ন করলেন কি এমন ঘটেছে যে ও এমন করছে ?

এমন কিছুই না, হার্গেসেল ওকে তুলে নিয়ে নাচাছিল তাই।

উনি আর স্থির থাকতে না পেরে তাড়াতড়ি চলে গেলেন উপর-তলায়। ঘরে ঢুকে দেখলেন স্লাপার ঘুমে অঘোর আর এলিনর বিছানার উপর চারদিকে বালিশ ছড়িয়ে মাঝখানে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কয়েকজন মহিলা তাকে ঘিরে ধরে শান্ত করবার চেষ্টা করছে।

কর্ণেলিয়াসকে আসতে দেখে মহিলারা ঘর থেকে চলে গেল। এলিনরকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে করতে বললেন, কি হয়েছে মা ? কে তোমাকে বকেছে ?

চোখের জলে ভিজে গিয়েছিল এলিনের গাল দুটো। পকেট থেকে রুমাল বের করে জল মুছিয়ে দিলেন। বাবার গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, আবেল, আবেল ম্যাক্স কেন আমার ভাই হতে চায় না ?

উনি বললেন, ও, এই কথা ?

আহত পাখির মতো এলিনরের ছোট্ট শরীরটা ফোঁপানির সঙ্গে

সঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল, কার জন্য এলিনরের এত কান্না সেই ম্যাক্স তখন হলঘরে নাচের আসরে বসেছিল।

এলিনরকে নিয়ে প্রায় কুড়ি মিনিট ধরে বিছানার ওপর বসে রইলেন কর্ণেলিয়াস। তাকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করলেন। একসময় আস্তে আস্তে সে ঘুমিয়ে পড়ল। তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে নিচের তলায় গেলেন একবার। দেখলেন নাচের আসর প্রায় শেষ হতে চলেছে। আবার ফিরে এলেন এলিনরের কাছে। তিনি দেখলেন এলিনর ঘুমিয়ে আছে গভীরভাবে, কিছুক্ষণ আগের ঘটনাও সে ভুলে গেছে। আজ আর কালের মধ্যে অনেক তফাৎ। প্রতিটি দিনের মধ্যে রাত্রির অন্ধকার যেন প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই প্রাচীর পার হতে গিয়ে আমাদের অনেক দুঃখ অনেক বেদনা শিশু এলিনরের মতো ভুলে যেতে হয়। এলিনর আগামীকাল সকালে উঠে আগের সব দুঃখ ভুলে যাবে। যে ম্যাক্সের জন্য সে এত কেঁদেছে, সেই ম্যাক্সই তার কাছে একটা অস্পষ্ট অর্থহীন ছায়া হয়ে উঠবে।

অন্তরঙ্গ বন্ধু

লুইজি পিরান্দেলো

একদিন সকালে গিগি মীয়ার উত্তরের ঠাণ্ডা বাতাসে শীতে কাঁপতে কাঁপতে লুন্দো তেভেয়ার দ্য মেলিনি নামে বড় রাস্তার কোন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছিল। তার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। ইতালির এক কাউন্ট পরিবারে সে জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু বর্তমানে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে গেছে। তাই বেঁচে থাকার প্রয়োজনে এখন তাকে চাকরি করতে হয়। কাউন্টদের কোর্টের অফিসে সে কোনমতে একটি চাকরি জোগাড় করেছে, এখন এই চাকরিই একমাত্র ভরসা। অফিসে যাওয়ার জন্যই সে ট্রামের আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

এ অঞ্চলের সকলেরি এমন অভিজ্ঞতা আছে যে প্রয়োজনের সময়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও ট্রাম পাওয়া যায় না। অনেক সমর ট্রাম আসতে আসতে মাঝপথে থেমে যায় তার কারণ কখনও কারেন্টের অভাব আবার কখনও পথচারিকে চাপা দিয়ে দুর্ঘটনার মধ্যে জড়িয়ে পড়া। বরফের মতো ঠাণ্ডা বাতাস অত্যন্ত নির্মমভাবে শরীরের সব উষ্ণতাকে শুষে নিচ্ছে। গিগি মীয়ার কুয়াশাভরা সামনের নদীটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হলো। একটা ট্রাম কাছে এগিয়ে আসছে। পন্তে কাড়ূর নামে নতুন ব্রিজটা অতিক্রম করে রাস্তার ঢাল বেয়ে ট্রামটা নামছে। গিগি মীয়ার যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সেখানে ট্রামটা থামবে না। ছুটে গিয়ে সামনের স্টপ থেকে ট্রামে ওঠার সুযোগ পাওয়া যাবে না। তাই সে চলন্ত অবস্থায় ট্রামে লাফিয়ে উঠতে যাবে এমন সময় শুনতে পেল পেছন থেকে কে যেন ডাকছে ও গিগি, গিগি শোনো।

গিগি পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখল একজন ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে। সে ট্রামে না উঠে থমকে দাঁড়াল। ডাক শুনতে পেয়েও চলে যাবার ইচ্ছে হয়নি। ট্রামটা তার জন্য অপেক্ষা না করেই চলে গেল। গিগি দেখল একজন অচেনা ভদ্রলোক ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

গিগি এবার ভালকরে লোকটির মুখের দিকে তাকাল। ভদ্রলোককে চেনা মনে হচ্ছে না, পুরনো অন্তরঙ্গ বন্ধুদের একজন হতে পারে। ভদ্রলোক তাকে বলল, তুমি আমাকে চিনতে পার নি? আমি কিন্তু তোমাকে দূর থেকে এক নজরেই চিনতে পেরেছি। একি তোমার মাথার চুল যে সব সাদা হয়ে গেছে। তুমি যে এরি মধ্যে বুড়ো হয়ে গেছ দেখছি। আমি প্রথমে ভাবলাম তুমি আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই অপেক্ষা করছ। পরে অবশ্য সে ভুল ভেঙে গেল যখন দেখলাম তুমি ট্রামে উঠতে যাচ্ছ।

জোর করে মুখে এক টুকরো হাসি ফুটিয়ে গিগি বলল, হ্যাঁ আমি অফিসে যাওয়ার জন্য ট্রামে উঠতে যাচ্ছিলাম।

গিগির কথা বিশ্বাস করতে না পেরে বলল, দয়া করে ওসব বাজে কথা বলো না আমার কাছে। তুমি চাকরি করছ এ কথা কি আমাকে মেনে নিতে হবে?

তুমি সত্যিই সেই আগের মতো অদ্ভুত আছ। এতদিন পর তুমি এতটুকু বদলাও নি। মানুষ কি চিরকাল একই রকম থাকতে পারে?

হ্যাঁ আমি অদ্ভুত। তাই তো একইরকম আছি। তুমি নিশ্চয়ই কোনদিন আশা করতে পারনি এখানে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। তাই না?

না। সত্যি কথা বলতে কি—

বন্ধু বাধা দিয়ে বলল আমি এখানে এসেছি গতকাল সন্ধের সময়। তোমার ভাই তোমাকে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি শুনে সে তো আমাকে একটা পরিচয় পত্র দিতে

চেয়েছিল তোমাকে দেবার জন্য যাতে তুমি আমাকে সহজে চিনতে পারো। গিগির মতো আমার এক ছেলেবেলার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য আবার পরিচয় পত্র লাগবে নাকি! সে তো জানে না তুমি আমার কতকালের চেনা। ছেলেবেলায় কত মারামারি কত ঘুষোঘুষি করেছি। স্কুল থেকে শুরু করে পদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত একসঙ্গে পড়াশুনা করেছি। মনে পড়ে তোমার সেই পুরানো দিনগুলোর কথা। সেই ঘটনাটা আমার এখনও মনে আছে। ভোরবেলায় বিছানা ছেড়ে ওঠার জন্য বড় ঘণ্টার শব্দ কানে এলেও তুমি উঠতে চাইতে না। এমনভাবে বিছানায় পড়ে থাকতে যেন শুনেও শোননি। তুমি শুয়োরের মতো ঘুমাতে। কত সুন্দর ছিল অতীতের সেইসব দিনগুলো, এখন মনে পড়লে মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে যায়। যাক সে সব কথা। এখন জীবন যেমন চলছে তাকে আমাদের মেনে নিতে হবে। ঈশ্বরের কৃপায় তোমার ভাই ভালই আছে। আমরা দুজনে মিলে একটা কারবার শুরু করেছি। সেই কারবারের একটা কাজের জন্য আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। তোমার কি খবর? তুমি যে দেখছি এই বয়েসেই বুড়িয়ে গেছ। বিয়ে করেছ?

না ভাই সে সুযোগ আর পেলাম কই?

তবে কি বিয়ে করবে বলে ভেবেছ?

তুমি কি পাগল হয়েছ? চল্লিশ পেরিয়ে যাবার পর বিয়ে? আমি তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি না।

চল্লিশ কি বলছ তোমাকে দেখে তো পঞ্চাশ মনে হচ্ছে। আসলে তোমার বিশেষত্ব এই যে তুমি কখনো ঘণ্টার শব্দ বা কালের পদধ্বনি কিছুই শুনতে পাওনা। আচ্ছা দেখা যাক তোমার প্রকৃত বয়স কত হয়েছে। আমার যতদূর মনে আছে সেই অনুযায়ী তোমার জন্ম তারিখ ১৮৫১ সালের ১২ই এপ্রিল তাই না? উত্তর না পেয়ে বলল তাহলে হয়তো ভুল বলেছি। মাপ করে দাও, আসল তারিখ হবে ১৮৫২ সালের মে মাসে।

গিগি বন্ধুর ভুল সংশোধন করে বলল, তুমি প্রায় কাছাকাছি গেছ, ওটা হবে ১৮৫১ সালের ১২ই মে। সেই অনুযায়ী আমার বর্তমান বয়স হবে ৪৯ বছর।

তবে দেখো এত বয়স হয়ে গেছে অথচ বাড়ীতে স্ত্রী নেই। আমার কিন্তু আছে। অবশ্য সে প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলে তুমি হেসে খুন হবে। আপাতত সে প্রসঙ্গ থাক। তার আগে কিছু খেয়ে নিই আমার খুব খিদে পেয়েছে। তুমি আমাকে খাওয়াবে তো? এখন কোথায় খাও? তোমার খাওয়ার তো একটাই জায়গা আছে, সেই পুরানো বার্বা।

গিগি বলল, আমি এখন আর বার্বাতে খাই না। জায়গাটা খুবই নোংরা। ওখানে বসে খেতে আমার গা গুলিয়ে ওঠে। আমি এখন বাড়িতে খাবার ব্যবস্থা করেছি। তুমি যদি আমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে চাও তবে এখনই বাড়ীতে গিয়ে যে মেয়েটি আমার সংসারের কাজকর্ম দেখে এবং রান্নাবান্না করে তাকে খবরটা দিয়ে আসতে হবে।

বন্ধু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল মেয়েটির বয়স কি কম?

না বুড়ি হয়ে গেছে। গত তিন বছর ধরে সে আমার বাড়ীতে আছে। ও আসার পর থেকেই আমি বার্বার খাওয়া বন্ধ করেছি।

ব্যবস্থাটা তাহলে চল্লিশের পরই করেছ দেখছি।

তুমি ঠিকই বলেছ। আমার মনে হয় চল্লিশের থেকে খুব সাবধানে দেখেশুনে জীবনের পথে চলা উচিত। যে পথ তোমাকে নিয়ে গিয়ে খাদের মধ্যে ফেলে দেবে সে পথে পা না বাড়ানোর মত নৈতিক সাহস থাকা উচিত সকলের। এখন চল আমার সঙ্গে। নিজের চোখেই দেখবে আমি কিভাবে সাজিয়েছি আমার ছোট সংসারটাকে।

গিগির বাড়ীতে যেতে আপত্তি করেনি। বাড়ীতে পৌঁছে বন্ধুর পিছু পিছু সিড়ি দিয়ে ওঠার সময় ও বলল তোমার মত লোকের এ কি অবস্থা হয়েছে? তুমি এখানে আছ কি করে? বাড়ীর মত নিয়ে কি তুমি এখানে এসেছ? ওরা তোমার প্রতি কি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি

দেখাতে পারে নি? ওদের নিষ্ঠুরতা তোমার কি হাল করেছে? তোমার অবস্থা দেখে আমার তো চোখে জল আসছে।

ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ঘর খোলার জন্য। গিগি বলল, ঘরে যেখানে মানুষ বাস করে সেখানেই এসেছ তুমি, আমি কবরখানায় নিয়ে যেতে চাই না তোমাকে!

বন্ধু বলল, শুধু দুটো পা থাকলেই কি মানুষ মানুষ হয়ে যায়? এক এক সময় তো আমাদের দুপায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে রীতিমত কষ্ট হয়। প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণে না এনে যদি ঠিকমতো তার পথে চলতে দেওয়া হয় তবে আমরা সকলেই একদিন চতুষ্পদ হয়ে উঠব। এই সভ্যতা অভিশপ্ত, আমাদের চরম সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে চলেছে। চতুষ্পদ থাকলেই আমাদের অনেক ভাল হত। আমরা জন্তু হয়েই থাকতাম। তাহলে আমার কোন স্ত্রী থাকত না, ঘরসংসার থাকত না, ঋণ থাকত না, কোন উদ্বেগ থাকত না।

হঠাৎ ভুইফোঁড় বন্ধুর মুখ থেকে এইসব তামাসার কথা শুনতে শুনতে মাথাটা ঠিক রাখতে পারছিল না গিগি। সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। কোথায় কিভাবে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল তা শত চেষ্টা করেও সে মনে করতে পারল না। তার পুরনো যে সব বন্ধুর চেহারা মনে ছিল তাদের সকলেই একে একে মনের পর্দায় ভেসে উঠল কিন্তু কারোর সঙ্গেই এর চেহারা কোন মিল খুঁজে পেল না, অথচ তাকে সরাসরি এ কথাটা জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা হল। কারণ প্রতিমুহূর্তে সে এমন অন্তরঙ্গতার ভাব দেখাচ্ছে যে তাতে অভিভূত না হয়েও পারছে না। এতক্ষণ ধরে কথা 'বলেও নামটা পর্যন্ত জানতে পারে নি। কৌশলে তার নামটা জেনে নেবে কথায় কথায়, সে ভাবল।

অনেকক্ষণ পরে ঝি এসে দরজা খুলল। ঝি বুঝতে পারেনি তার মালিক অফিসে যাবার জন্য বেরিয়ে আবার কিছুক্ষণ পর ফিরে আসবে। তাই গিগিকে দেখে কিছুটা হকচকিয়ে গেল। সে ঝিকে বলল, আমাকে ফিরে আসতে হল, সঙ্গে লোক আছে। আমাদের

দুজনের জন্য খাবার ব্যবস্থা করো। একটু দেখেশুনে করো যাতে কোন ত্রুটি না থাকে। খেয়ে তৃপ্তি না পেলে বাইরে কিন্তু আমাদের বদনাম রটাবে। আমায় বন্ধুর নামটা কিন্তু বড় অদ্ভুত, শুনে তুমি একটুও ঘাবড়ে যেও না।

বন্ধু হাসতে হাসতে ঠাট্টা করে বলল আমার নাম এ্যাবক্রোপোথেনাস গোটস্ বিয়ার্ডহর্নফুট। এমন বড় নাম বাপের জন্মে কেউ শোনে নি। উপস্থিত দুজনেরই এই নাম শুনে চোখগুলো প্রায় কপালে উঠে যাবার জোগাড়। ও দুজনকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলল নামটা কি খুব বিদঘুটে শোনাচ্ছে? আসলে আমার এই নামটা একমাত্র আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ পছন্দ করে না। নামের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে বলল, আচ্ছা গিগি তুমি তো এখনো পর্যন্ত দেখালে না তোমার সংসার কেমন সাজিয়েছ, তোমার ঘরের জিনিসপত্রগুলো আমাকে দেখাও। ঝি তখনও দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছে দেখে বলল, তুমি এখনও এখানে রয়েছ যাও বুড়ো খুকী রান্নাঘরে, আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করো।

গিগির নাম জানার কৌশলটা ব্যর্থ হয়ে গেল। এখনই নতুন কোন কৌশল অবলম্বন করা সম্ভব নয়। তাই সে বলল, চলো তোমাকে আমার সংসারটা ঘুরিয়ে দেখাই। তার ফ্লাটে যে পাঁচটি ঘর ছিল সব ঘরগুলো এক এক করে দেখাল ভদ্রলোককে। এটা তো বাড়ি নয় যেন একটা শামুকের খোল। এর মধ্যেই সে নিজেকে আবদ্ধ রেখে অবসর সময়টুকু কাটায়, আর কোন কিছুই সে চায় না। জীবনের চাহিদা কমিয়ে অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে তার কোন অসুবিধা হয় না। পাঁচটি ঘরের মধ্যে একটি বসার, একটি শোবার একটি খাবার, একটি স্নানের আর একটি পড়ার।

তারপর ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল বসার ঘরে। গিগি আপন মনে ভাবছে লোকটা নিজের সম্পর্কে এখনও কিছুই বলে নি কেন। এখানে প্রথম দিন এসেই এত অন্তরঙ্গ হয়ে পড়তে চাইছে, মাথায় আবার কোন বদ মতলব নেই তো! হঠাৎ সে বলে উঠল আমার

শালাটা ভীষণ পাজী। একটা ব্যাপারে তোমার ভাই আমাকে সাহায্য করবে বলে কথা দিয়েছিল। সব কিছু প্রায় ঠিকঠাকই ছিল শুধু একটা সই-এর প্রয়োজন। হঠাৎ আমার শালা বাগড়া দিয়ে বসল, ও কিছুতেই ব্যাপারটা মেনে নিল না। আমি কেন যে ওর বোনকে বিয়ে করেছিলাম? তুমি কল্পনা করতে পারবে না এমন সংঘাতিক কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিল। আমাকে নিবৃত্ত করার জন্য বিষ খেয়েছিল।

সে কি! তবে কি তোমার স্ত্রী মারা গেছে?

না, মারা গেলে আমি বেঁচে যেতাম। বিষ খেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই বমি করে বার করে দিয়েছিল, তাই বেঁচে গেছে। এই ঘটনার পর থেকে আমি শালার বাড়ীতে পা দিই না। গলাটা একটু চড়িয়ে বলল, কই, খাবার তৈরি হলো না এখনও। ক্ষিদেতে আমি চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আমার অবস্থা এখন ঠিক এক ক্ষুধিত নেকড়ের মতো।

ভদ্রলোকের এইসব গোপন পারিবারিক গল্প শুনতে শুনতে ক্রমশই বিরক্ত হয়ে উঠছিল গিগি। কিন্তু তার প্রকাশ 'ঘটিয়ে ভদ্রলোককে চটিয়ে দিতে চাইল না। ইতিমধ্যে খাবার তৈরি হয়ে গেছে। খেতে বসে গল্প চলছে সমানতালে। গিগি মাঝে মাঝে পরিচিতদের নাম জিজ্ঞাসা করে তার নামটা জেনে নিতে চাইল।

গিগি নানা কথার ফাঁকে একসময় জিজ্ঞেস করল, তুমি কি একটা খবর আমাকে দিতে পারবে? ইতালির এক ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর ভালডার্সের সম্পর্কে তুমি কি কোন খবর জান? তার স্ত্রী খুবই সুন্দরী। আর বোধহয় তার এক ট্যারা বোন ছিল। তারা কি এখনও পাদুয়াতে আছে?

ভদ্রলোক প্রশ্ন শুনে হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। হাসির কোন কারণ বুঝতে না পেরে গিগি হতভম্ব হয়ে গেল। কিছুই বুঝতে না পেরে কৌতুহলী হয়ে সে জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে? তবে কি মেয়েটা ট্যারা নয়?

আরে থাম থাম, শুধু ট্যারা নয়, তার নাকের ফুটো দুটো এত চওড়া যে তার ভিতর দিয়ে মাথার ঘিলুটাও দেখা যায়। ঐ মেয়েটার কথাই তো তুমি বলছ ?

বোধহয় সেই মেয়েটাই হবে।

আরে তুমি জানো না, ও তো আমার স্ত্রী।

একথা শুনে অবাক হয়ে গিগি তাকিয়ে আছে ভদ্রলোকের দিকে। অথচ ভদ্রলোক নিজের মনে আরো জোরে হাসতে লাগল। অবশেষে হাসি থামিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, সাধারণ মানুষ এক এক সময় এমন বীরত্বের কাজ করে ফেলে যা নিজেই কল্পনা করতে পারে না, যার কথা কেউ জানে না এবং অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে অনুমান করাও মুশকিল।

আমি জানি তুমি কার কথা বলছ।

না, তুমি কিছুই জানো না। আমি বলছি আমার কথা। বীরত্ব হলো লুমিও ভালডার্সের স্ত্রীর আর আমি হয়েছিলাম সেই বীরত্বের শিকার। আমার মতো বোকা লোক এ পৃথিবীতে নেই।

গিগি হঠাৎ কৌতুক করে বলল, আমি তোমার চেয়েও বোকা।

না আমিই বোকা। বোকা না হলে আমি কি ষড়যন্ত্রের জালে ধরা পড়তাম ? ভালডার্সের স্ত্রী আমাকে একদিন ডেকে পাঠালো। কেউ ডেকে পাঠালে না যাওয়া তাকে অপমান করারই সমান। তাই আমি সরল মনে তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলাম। আমি যখন তার বাড়ীতে গেলাম তখন ভালডার্স সেখানে ছিল না। আমাকে ওর স্ত্রী ভালডার্সের বোনের ঘরে নিয়ে গেল। অর্থাৎ সেই ট্যারা মেয়েটির ঘরে। আমাকে সেখানে বসতে বলে সে চলে যায়, আমি মেয়েটির সঙ্গে বসে সবে কয়েকটি কথা বলেছি, এমন সময় ভালডার্স এসে ঘরে ঢুকল। সে বলল, তুমি আমার বোনকে বিয়ে করতে রাজী আছ জেনে আমি খুবই আনন্দিত হলাম। এ কথা শুনে আমি যেন আকাশ থেকে পড়েছি। সত্যিই আমার বিয়ে করার কোন ইচ্ছেই ছিল না।

গিগি জিজ্ঞেস করল, তুমি তাকে বিয়ে করেছ নাকি ?

কি করব আর, আমি আপত্তি করাতে ভালডার্স বলল, তবে তুমি কেন এসেছ এ বাড়ীতে ? আমি কোন উত্তর না দিয়ে বোকার মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার ওপর জোর করে তার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিল। বিয়ে হল, কিন্তু আমি বিয়ে করিনি, সেই মেয়েটিই আমাকে বিয়ে করেছে। অথচ আমার পকেটে টাকাপয়সা কিছুই নেই। টাকা পয়সার জন্য ধান্দা করেও আমি তেমন কিছু করতে পারিনি। এখন আমার চারদিকে ঋণ, আমি কি করব জানি না।

গিগি বলল, তাহলে ভালডার্সের বোন এখন তোমার স্ত্রী।

ভদ্রলোক বলল, হ্যাঁ, বিয়ে যখন করেছি তখন সেই আমার স্ত্রী। আজকের দিনটা তোমার সঙ্গে গল্প করে বেশ ভালই কাটল। তুমি কি আমার একটা উপকার করতে পারবে ?

গিগি জানতে চাইল, কি সে উপকার ? যদি সাধ্যের মধ্যে হয় চেষ্টা করব।

ভদ্রলোক বলল, তোমার কাছ থেকে আমি কিছু টাকা নেব তার বিনিময়ে আমার স্ত্রীকে তোমার কাছে গচ্ছিত রাখব।

গিগি বলল, দুঃখিত এ ধরনের উপকার আমি করতে পারব না। আমি তোমার আসল নামটা জানতে চাই।

আমার নাম তুমি জানো না ? গিগির নাম জানার আগ্রহ দেখে খুবই আশ্চর্য বোধ করল। বুকের ওপর আঙুলের ডগাটা রেখে গিগির দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কি সত্যিই বলছ ? আমার নাম তুমি মনে করতে পারছ না ?

গিগি বলল, সত্যিই আমার স্মরণ শক্তি খুবই কমে গেছে। তোমার নাম আমার মনে নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে আত্মভোলা মানুষ হিসাবে আমাকে ক্ষমা করো। আমি শপথ করে বলতে পারি আমি জীবনে কখনো তোমাকে দেখিনি।

ভদ্রলোকের ব্যবহারে তেমন কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করল না গিগি। ঠিক আছে, তুমি যখন আমাকে চিনতেই পারছ না আমি আর কি

করতে পারি। তুমি যে আমাকে এতক্ষণ সাহচর্য দিয়েছ ও লাঞ্চ খাইয়েছ তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার নাম না বলেই আমি চলে যাচ্ছি।

গিগি লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে রাগে গরগর করতে করতে বলল, তোমাকে তোমার নাম বলতেই হবে। সারাদিন তোমার সঙ্গে থেকে আমি অনেক বিব্রত বোধ করেছি। নাম না জানালে আমি তোমাকে কিছুতেই এখান থেকে যেতে দেব না।

শান্তভাবে ভদ্রলোক উত্তর দিল, আমায় তাহলে খুন করো। আমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেল, তবু কিছুতেই আমি নাম বলব না।

গিগি এবার তার গলার স্বর পরিবর্তন করে শান্ত গলায় বলল, জীবনে আমি কোনদিন এ ধরনের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হইনি। আমার কাছে এ ঘটনা সত্যিই দুঃখজনক। তুমি আমার মনে ক্ষত হয়ে থাকবে। দয়া করে তুমি নামটা বল।

তুমি নিজেই চেষ্টা করো ঠিক মনে করতে পারবে।

দেখ, আমার স্মৃতি থেকে তুমি হারিয়ে গেলেও আমি তোমাকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গতার সঙ্গে ঘরে এনে খাইয়েছি। তোমাকে না চিনেও তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছি। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। আমি তোমার বন্ধুত্ব আর সাহচর্য সবসময় কামনা করি। দয়া করে শুধু তোমার নামটা বল।

এত অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও ভদ্রলোক এতটুকু টলল না। আগের মত শান্ত গলায় বলল কোন লাভ নেই। তোমাকে আমার নাম না জানিয়ে তোমার আতিথ্য গ্রহণ করে যে অপ্রত্যাশিত আনন্দ আমি লাভ করেছি তা থেকে তুমি কি আমাকে বঞ্চিত করতে চাও? বরঞ্চ আমার নাম যে তুমি ভুলে গেছ তাতে ভালই হয়েছে। তুমি আমাকে ভুলে গেছ তাতে আমি যে ব্যথা পেয়েছি তা যদি আমার মন থেকে দূর করতে চাও তবে আমাকে চলে যেতে দাও।

গিগি বলল ঠিক আছে তবে এক্ষুনি চলে যাও। তুমি আর

এক মুহূর্ত আমার সামনে থেকো না, আমি তোমাকে সহ্য করতে ছি রাপনা।

ঠিক আছে আমি চলে যাচ্ছি। আমি তোমাকে আর বিরক্ত করব না। চলে যাওয়ার আগে আমার কপালে একটু চুমু খাও বন্ধু।

না। তুমি নাম না বললে আমি কিছুই করব না।

তবে আমি চলছি, বিদায় বন্ধু।

এই বলে হাসতে হাসতে চলে গেল ভদ্রলোক। গিগি ভেবে পেলনা নাম জানালে কি এমন ক্ষতি হত ভদ্রলোকের।

পরিবর্তন

আইজ্যাক ব্যাসেভিস সিংগার

উলফ বার বাড়ী ফেরার সময়ে প্রত্যেকবারই স্ত্রী সেলিয়া ও মেয়েদের জন্য কিছু না কিছু উপহার কিনে নিয়ে যায়। অনেকদিন প্রবাসে থাকার পর বাড়ীতে ফিরে ওদের হাতে নতুন কিছু দিতে না পারলে মনটা কেমন যেন খচখচ করে। ওরাও তো অনেক আশা নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে। উপহার হাতে পেয়ে সকলের মন যখন খুশীতে ভরে ওঠে তখন উলফ বারও কম তৃপ্তি পায় না। এবার বাড়ীতে ফেরার সময় পকেটে ভর্তি হয়ে আছে অনেক রুবল, তাই সে ভাবলো এবার ভাগ্যটা অনেক ভালো। একটা সিন্দুক ভেঙে ৭৫০ রুবল চুরি করতে পেরেছে, ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকলেও কোনমতে রক্ষা পেয়েছে। তাছাড়া রেলের সেকেণ্ড ক্লাসে চড়ে সে যখন আসছিল তখন একজন পয়সাওয়ালা রাশিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। ভদ্রলোকটি জুয়া খেলতে ভালবাসে। উলফকে খেলার জন্য অনুরোধ করতে সে রাজী হয়ে গেল। কিন্তু মনে ভয় যদি খেলতে গিয়ে হেরে যায় তবে পকেট খালি হয়ে যাবে। ভয়ে ভয়ে খেলা শুরু করেও শেষপর্যন্ত ১৫০ রুবল জিততে পেরেছে। জীবনের অনেক ঘটনা থেকে উলফবার মনে মনে এই ধারণা তৈরি করে নিয়েছে যে এই পৃথিবীর সবকিছুই নির্ভর করে আছে নিয়তির ওপর। তার কৃপা না পেলে হেরে যাওয়ার সম্ভাবনা। এবারের সব চেষ্টায় সাফল্য লাভ করেছে, তাই সব ব্যাপারে একটা শুভযোগ সে লক্ষ্য করতে পারছে। সিন্দুক ভাঙা যার পেশা পকেট মারা তার কাজ নয়। সুতরাং এই কাজে তার দক্ষতা নেই। শুধু মজা করার জন্যই সে একজনের পকেট মেরেছে। তাতে সে পেয়েছে রুবলে ভর্তি একটা মানিব্যাগ। তারপর এক দোকান থেকে একটা সোনার ঘড়ি হাত-সাফাই করতে পেরেছে। 'ব্যবসার' কাজে সাফল্য লাভ করলে

ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়। গরীবদের সাহায্য করার জন্য মনটা উতলা হয়ে ওঠে। ওদের সাহায্য করার জন্য পথের ধারে বাক্স রাখা থাকে সেখানে গিয়ে অত্যন্ত খুশি মনে পয়সা ফেলে দেয়। উলফবার তার কাজের জন্য কোন দল তৈরি করেনি, একা একা কাজ করতেই সে ভালবাসে। অন্যকোন দলের সদস্য সে হতে চায় না। কাজের জন্য কারো কাছে কৈফিয়েৎ দেবার মত মন নেই, সম্মানজনকভাবে কাজ করতে ভালবাসে। সে জানে চুরি করা পাপ কিন্তু ব্যবসায়ীরাও তো চুরি করছে। ওরা কম কিসে? সস্তা দামে জিনিস কিনে কি চড়া দামে বিক্রী করে না? ওরাও কি গরিবদের রক্ত শুষে নেয় না। ওরাও কি কয়েকবছর অন্তর অন্তর দেউলিয়া হয়ে যায় না? উলফ বার বর্তমান ব্যবসা শুরু করার আগে লাবলিনের এক ট্যানারীতে কাজ করত। সেখানে ছিল হাড়ভাঙা খাটুনি। কিন্তু তার বিনিময়ে পারিশ্রমিক পেত খুবই সামান্য। ফোরম্যান বেশী কাজ আদায় করে নেবার জন্য কেবলই চেঁচাত। তাছাড়া ধুলো আর গরম চামড়ার দুর্গন্ধ কিছুতেই সে সহ্য করতে পারত না। এমন পরিবেশে খাপ খাওয়াতে না পেরে সে ভাবত, এর থেকে জলে পচে মরাও ভাল।

চুরি করার কাজে অনেকদিন ধরে আছে বলেই এখন বেশ রপ্ত হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম অপটু হাতে কাজ করতে খুবই অসুবিধা হত। তার জন্য পুলিশের হাতে ধরাও পড়েছে বেশ কয়েকবার। ছাড়া পেয়েছে খুব সহজে। প্রত্যেকবার একই শাস্তি হয়েছে। ধরা পড়ার পর পুলিশের কাছে অপরাধ স্বীকার করে নেয়। পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কথা বলতে হয় কিভাবে তা সে ভাল করেই জানে। অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করে বলে, স্যার, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন স্যার, বাড়ীতে আমার বউ ছেলেমেয়ে আছে, তারা না খেতে পেয়ে মারা যাবে, আমি ছাড়া তাদের দেখার কেউ নেই। এইসব কথা শুনে কেউ কি আর নির্দয় হয়ে উঠতে পারে? কোনদিন পুলিশের মুখের ওপর কোন জবাব দেয় না, হম্বিতম্বি করে ন, গুণ্ডামি করার কথা ভাবতেও পারে না। উলফ ভাল পরিবারে জন্মেছে।

ওর বাবা খুব ধার্মিক ছিল, বাড়ীতে বাড়ীতে রঙ লাগানোর কাজ করত। আর যখন সেকাজ জুটত না তখন মাংস বেচত।

এমন পরিবারে জন্মে উলফই একমাত্র ছেলে যে চুরি করার কাজ বেছে নিয়েছে। এখন তার বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি। উচ্চতা মাঝামাঝি কাঁধ চওড়া, চোখের রঙ বাদামী, ইয়া মোটা গোঁফজোড়া পোলিশ কায়দায় মোচড়ানো। সে শিকারীর মত আঁট সাঁট প্যান্ট পরতে ভালবাসে, পায়ে বুট, বুটের ওপর দিকটা পায়ের সঙ্গে আঁটা। হাতকাটা জামা পরে, বোতামের সঙ্গে লাগানো একটা ঘড়ির চেন ঝোলে, চেনের শেষ প্রান্তে রয়েছে কানের ময়লা পরিস্কার করার কাঠি। অন্য চোরদের সঙ্গে থাকে বন্দুক বা স্প্রিংনাইফ। উলফবার সঙ্গে কোন অস্ত্র রাখা পছন্দ করে না। সে জানে অস্ত্র সঙ্গে থাকলে প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য হাত নিসপিস করবে। বন্দুক থাকলে গুলি ছুড়তে হবে আর ছোরা থাকলে অন্যের শরীর থেকে রক্ত ঝড়াবে। অন্য মানুষের প্রাণ নিয়ে লাভ কি ? কারোকে হত্যা করার অপরাধে শাস্তি হবে অনেক গুরুতর। এমন ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে লাভ কি ? উলফবার অন্য চোরদের থেকে অনেক সংযত ও সাবধানী মানুষ। সে দুর্দান্ত স্বভাবের নয়, ভাবনাচিন্তা করে কাজ করে বলে খুব বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারেনা। সময় সুযোগ মতো গল্পের বই পড়ে। এমনকি দৈনিক সংবাদপত্রের পাতায় চোখ বোলাতে ভোলে না। স্ত্রী আর মেয়েদের নিয়ে তার ভাবনা বেশী। সংসারের প্রয়োজনে ওকে টাকা রোজগারের ধান্দায় সবাইকে ছেড়ে একা একা দূরে থাকতে হয়। সে কখনও মদ খায় না। কোজলোতে বাগান সমেত তার একটা বাড়ি আছে। তার মেয়েরা স্কুলে লেখাপড়া শিখতে যায়। পিউরিস উপলক্ষে সে ইহুদী ধর্মযাজক র‍্যাবিকে উপহার পাঠায়। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে তার কোন বিরোধ নেই। পাসওভারের বার্ষিক উৎসবের আগে সমাজের গরীব বৃদ্ধরা তার বাড়ীতে আসে সাহায্য পাবার আশায়।

এবার বাড়ী আসার পথে লুবিন-এর এক স্যাকরার দোকান

থেকে কিনেছে স্ত্রী সেলিয়ার জন্য এক জোড়া সোনার ইয়াররিং এবং দুই মেয়ের জন্য দুটো বড় পদক। রেইভিজ পর্যন্ত সে এসেছে ট্রেনে, তারপর সেখান থেকে কোজলো পর্যন্ত ক্যারেজ ওয়াগনের ড্রাইভারের পাশে বসে।

বছরে চারবার বাড়ি ছেড়ে যেতে হয় উলফবারকে। কোন ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে না পড়লে সপ্তাহ ছয়েকের মধ্যে বাড়ি ফিরে আসে। সে প্রত্যেকবার একই শহরের একই মেলায় যায়। কোজলো শহরের সকলেই তার জীবিকার কথা জানে। কিন্তু এই শহরে সে কখনও চুরি করে না। পরিচিত মানুষের জিনিস চুরি করতে তার বিবেকে লাগে। সে যখন বাড়িতে থাকে না, সেলিয়াকে সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে কোন অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয় না। দোকানদাররা অনেকদিনের পরিচিত, তাই ধারে মাল-পত্র দেয়। উলফ বাড়িতে ফিরে এলে সমস্ত দেনা মিটিয়ে দেয়। কারো একটা পাইপয়সাও সে কখনও মারেনি। একবার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে হাজতবাস করতে হয়েছিল। ইয়ানো জেলে আটক অবস্থায় সে কেবলই ভেবেছে সেলিয়ার কষ্টের কথা। কিন্তু কোজলোর ব্যবসায়ীরা সেলিয়াকে বিপদে ফেলেনি, আগের মত সাহায্য করেছে। তারা কয়েকশ রুবলের মাল ধারে দিয়েছে। তারা নিশ্চিত জানে একটা পয়সাও অনাদায়ী থাকবে না। সেলিয়া অবশ্য মাঝে মাঝে বলে, দোকানদাররা ওজনে কম দেয়, মালের দাম অনেক বেশি নেয়, তাই বিলের হিসাবে অনেক টাকা বাড়িয়ে লেখা থাকে। কিন্তু সেলিয়ার এই অভিযোগের কোন গুরুত্ব দেয় না উলফবার, দোকানদারদের সঙ্গে সেই নিয়ে তর্ক করেনি কোনদিন। সে জানে পৃথিবী এমন নিয়মে চলছে।

প্রত্যেকবারের মত এবারও সে বাড়ি ফিরছে সেলিয়া ও মেয়েদের জন্য বুকভরা পতীক্ষা নিয়ে। সেলিয়ার হাতের রান্নার একটা আলাদা স্বাদ আছে, তার মত রাঁধতে কেউ পারে না। এখানে ওখানে খেয়ে মন কিছুতেই ভরে না, আবার অনেকদিন পর সেলিয়া যত্ন করে রেঁধে

খাওয়াবে। বাড়ির বিছানার মত নরম বিছানা কোন সরাইখানায় পাওয়া যায় না। বালিসের ওয়াড় আর চাদরগুলো কি পরিস্কার আর সুন্দর ডিজাইনের, সেলিয়ার পছন্দের তারিফ করতে হয়। রেশমের মত মসৃণ ও ল্যাভেনডারের গন্ধ ছড়ানো বিছানায় শুয়ে ঘুমাবার আনন্দ আর কোথাও পাওয়া যায় না। সেলিয়া এসে পাশে বসে, অনেক গল্প করে, এতদিন না দেখা হওয়াতে মনের মধ্যে অনেক কথা জমা করে রেখেছিল। মেয়েরা বাবাকে দেখতে পেয়ে কাছে ছুটে আসে। যদিও একজনের বয়স এগার আর একজনের দশ, তবু ওরা বাচ্চা মেয়ের মত ঘাড়ের ওপর উঠে বসে, গালে চুমু খায়, স্কুলের খাতা, বই, ড্রয়িং, লেখা, পরীক্ষার নম্বর সব দেখায়। বাবাকে সবকিছু না দেখানো পর্যন্ত তাদের স্বস্তি নেই। উলফ মেয়েদের দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে, ওরা কি আগের থেকে রোগা হয়ে গেছে? বাবাকে কাছে না পেলে ওরা যেন বিন্দুমাত্র কষ্ট না পায়। মেয়ে দুটো খৃষ্টানদের মতো পোশাক পরতে ভালবাসে। আলপাকার অ্যাপ্রণ পরে, চুলে রিবন বেঁধে, পায়ে চকচকে জুতো পরে স্কুলে যায়। ওরা ইদ্দিশ ভাষা ছাড়াও রাশিয়ান ও পোলিশ ভাষা শিখেছে। ওরা এমন সব দেশ এমন সব নগরীর গল্প বলে যাদের নাম উলফ কোনদিন শোনেনি। ওরা রাজরাজড়া ও যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস পড়ে। কেমন সুন্দর ছড়া ও কবিতা মুখস্থ বলতে পারে। এত ছোট মাথায় এত জ্ঞান ঢোকে কি করে উলফ অবাক হয়ে ভাবে। ওরা এত কিছু জেনে ফেলেছে শুনে উলফের বুক গর্বে ফুলে ওঠে। বাবা কি চাকরি করে সে ব্যাপারে মেয়েরা কিছু জানে না, তাদের কোন কৌতূহল নেই। ওদের ধারনা ওদের বাবা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে জিনিস বিক্রি করে। ওদের খৃষ্টান প্রতিবেশীরা হয়তো জানে উলফবারের জীবিকাটা কি ধরনের, কিন্তু সে ব্যাপারে ওরা কোন মতামত প্রকাশ করে না। খ্রীষ্টমাস ও ইস্টার উপলক্ষে ওদেরকে উপহার পাঠায় উলফবার।

বাজারের কাছে এসে থামে ক্যারেজ ওয়াগনটা। পিউরিসের

উৎসব শেষ হবার পর বেশীদিন যায়নি। কয়েকদিনের মধ্যেই শুরু হবে ইহুদীদের বার্ষিক পাসওভারের উৎসব। মিশরবাসীদের প্রথম সন্তানকে হত্যা করে ঈশ্বর ইহুদিদের নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন, সেই ঘটনাকে স্মরণ করেই প্রতিবছর এই উৎসব হয়। দিনের উজ্জল সূর্যের উত্তাপে সেই আসন্ন উৎসবের বুকে উষ্ণতার ছোঁয়া লেগেছে। রাস্তায় কাদার মাঝে মাঝে সোনালী জলের ধারা। ঘোড়ার মল থেকে শস্যকণা খুটে খুটে খায় পাখীরা। জলকাদার ভেতর দিয়ে হেঁটে চাষীর মেয়েরা মূলো, শাক, বীট আর পেঁয়াজ বিক্রি করছে। ঘোড়ার গাড়ি থেকে নীচে নেমে কোচোয়ানের পাওনা মিটিয়ে দিল। এমন একটা ভঙ্গী করল যেন সে এই শহরের নামজাদা বড়বাবু। ভাড়ার সঙ্গে আরো কুড়ি 'গ্রোসজী' দিয়ে দিল বকশিস হিসাবে। তামার তালা লাগানো সাইড পকেটওলা চামড়ার স্যুটকেশটা হাতে তুলে নিয়ে সে হাঁটতে শুরু করল, এখন তাকে যেতে হবে চার্চ ষ্ট্রীটের দিকে। রাস্তার দুধারের দোকানদাররা তাকে কৌতূহলের দৃষ্টি নিয়ে দেখছে। মেয়েরা পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে আর কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে কাঁচের ওপর থেকে কুয়াশার জল সাফ করছে। কোথা থেকে হঠাৎ উদয় হয় বোকা চ্যাজকেল, কিছু পয়সা ভিক্ষে পাবার আশায় হাত বাড়ায়। তাকে নিরাস করতে চাইল না, তার বাড়ান হাতে কয়েকটা পয়সা দিল। মাংসের দোকানের পাশে বসে কুকুরগুলো পর্যন্ত খুশি হয়ে লেজ নাড়ছে।

উলফবার মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল. এবার পাসওভার উৎসবে বাড়ীতে থাকার সুযোগ পাবে এই কথা ভেবে। সেলিয়া উৎসবের আয়োজন করবে। প্যানকেক ও মাছ খাওয়া হবে। এবার পকেটে অনেক পয়সা আছে, পরিবারের সকলের জন্য নতুন পোশাক তৈরি করতে হবে। এমনভাবে পয়সা রোজগার করে সঙ্গে সঙ্গেই খরচ করে ফেলাই ঠিক। পয়সা জমিয়ে রাখলে যদি কেউ জানতে পারে তাহলে অনেক বিপদ। বেকারীর পাশ দিয়ে যাবার সময় খুব পরিচিত একটা গন্ধ তার নাকে এল। 'মাজো' কেক

তৈরি করার জন্য মেয়েরা জল দিয়ে ময়দা মাখছে। তাদের পরণে সাদা অ্যাপ্রণ, মাথার চুল রুমাল দিয়ে বাঁধা, পরিশ্রম করার জন্য মুখ লাল হয়ে উঠেছে। একজন জল ঢালছে, আর কয়েকজন ময়দা মাখছে। চুল্লিতে শেকা রুটি কোদাল দিয়ে বার করতে ব্যস্ত একজন পুরুষ। লম্বা ঝুল্‌কি, মাথায় স্কালক্যাপ লাগিয়ে ওভারসিয়ার দাঁতমুখ খিচিয়ে চিৎকার করে সকলকে কাজ করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছে।

হঠাৎ বাবা মার কথা মনে পড়ে যায় উলফবারের। কতদিন আগে মারা গেছেন। এখন তাঁরা কোথায় আছেন? স্বর্গের নন্দন কাননে নিশ্চয়ই স্থান পেয়েছেন। তাঁদের মতো ধার্মিক মানুষের স্থান ওখানেই হয় এমন কথাই তো সে শুনেছে। কিন্তু তাদের সন্তান ধর্মের পথে যায়নি। তবে সে বাবার কবরের ওপর একটা পাথরের ফলক তৈরি করেছে। প্রতি বছর মৃত্যুদিনে সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়, ধর্মগ্রন্থ থেকে আবৃত্তি করে, ধর্মগ্রন্থ পড়ার জন্য একজন ইহুদীকে পয়সা দেয়। হ্যাঁ উলফবার পাপী। পাপীদের করুণা করতে পারেন ঈশ্বর। না হলে, নোয়ার সময় যেমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি এক সর্বনাশা বন্যায় নিজের সৃষ্টিকে ভাসিয়ে দিতে পারতেন ঈশ্বর।

চার্চ ষ্ট্রীটে ঢুকতেই তার মনে হঠাৎ কেমন যেন একটা ভয় দেখা দিল। মানুষের জানার বাইরের কোন শক্তি এসে তাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, মনে তোমার এত খুশির হাওয়া লেগেছে কেন? পাসওভারের উৎসবের সময় তো এখনও আসেনি। উলফবার ভাবে তবে কি তার স্ত্রী সেলিয়া অসুস্থ? মেয়েদের শরীর কি খারাপ? পুলিশ কি তার অপরাধের জন্য তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরবে? কিন্তু কেন? সে তো অপরাধের কোন প্রমান রাখেনি। চারদিক থেকে এইসব আশঙ্কা হঠাৎ তার মনের মধ্যে এসে ভীড় করেছে, মাথা টলে মাটিতে পড়ে যেতে পারে। ভয়টাকে মন থেকে সরাতে হবে এখনই তাই সে একটা সরু রাস্তায় ঢুকে তাড়াতাড়ি পা চালায়। বাড়ীতে তাড়াতাড়ি পৌঁছবার জন্য এই রাস্তাটাই সবচেয়ে উপযুক্ত। রাস্তার

দুপাশে সারি সারি বাড়ীগুলো অত্যন্ত নীচু, যেন বামনদের থাকার জন্য বাড়ীগুলো তৈরি হয়েছে, কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বাড়ীর সীমানা ঠিক করা হয়েছে। বরফ পড়েছে অনেক আগে, আধগলা বরফের মাঝে মাঝে উঁকি মারছে মাটি, দেখতে অনেকটা চালুনির মতো মনে হয়। সেখানে দেখা যাচ্ছে গত বছরের সূর্যমুখী ফুলের শুকনো ডাল। কোথাও কোন পরিবর্তনের চিহ্ন চোখে পড়ছে না। সবকিছুই তো ঠিক আছে। নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। তার মনের উদ্বেগ কিছুটা কমেছে। বাড়ীতে পৌঁছেই তাড়াতাড়ি দরজা খোলে, ভেতরে পরিবারের সকলকেই সে দেখতে পায়। রান্নাঘরে স্টোভ জ্বালিয়ে রান্নার কাজে ব্যস্ত সেলিয়া। স্ত্রীকে লক্ষ্য করে, মাথার সোনালি চুল ঝুটিবাঁধা, মুখটা ফরসা, চোখমুখে কোন দুশ্চিন্তার ছায়া নেই। পায়ে লাল রঙের চপ্পল পরেছে, এমন সুন্দর পায়ে এই রঙের চপ্পলই ভাল মানায়। সেলিয়াকে আগের থেকে বেশি সুন্দরী দেখে নিশ্চিন্ত হল। মেয়েরা টুলে বসে কি যেন খেলছে। ওকে দেখেই সকলে হৈ চৈ করে ছুটে এল ওর কাছে। সেলিয়া আরেকটু হলেই উনুনের ওপর চাপানো পাত্রটা উল্টে ফেলত। মেয়েরা এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরে চুমুতে চুমুতে তার মুখটা ভরিয়ে দিল। বাপের ঘাড়ের ওপর কে আগে উঠতে পারে তাই নিয়ে দুই মেয়ে মাশা আর আনকা মারামারি করতে শুরু করেছে। ওদের থামাবার জন্য উলফবার স্যুটকেশ খুলে উপহারগুলো বার করতে আরম্ভ করল। উপহার হাতে পেয়ে ওরা সকলে খুশি, তাই নিয়ে একদফা চেঁচামেচি হয়ে গেল। পাশের ঘরে কাকাতুয়াটা প্রভুর গলার শব্দ শুনে তখন থেকেই চেঁচাচ্ছে। ওর সামনে গিয়ে আদর না করা পর্যন্ত চুপ করবে না। এইবার সে পাশের ঘরে গেল কাকাতুয়াকে দেখতে। পাখিটা ডানা ঝাপটে তার কাঁধের ওপর এসে উঠে বসেছে। শীতের পালক ঝরে পাখিটার গায়ে নতুন চকচকে পালক গজাচ্ছে। পাখিটা বলল, বাবা, বাবা।

মাশা জিজ্ঞেস করে পাখিটাকে, তুই বাবাকে ভালবাসিস?

ভালবাসা, ভালবাসা, ভালবাসা, উত্তর দেয় পাখিটা।

সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেও তার চোখে এমন কিছু পড়েনি যাতে সে ভয় পেতে পারে। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের মনেই বলল, নাঃ ভয়ের কোন কারণ নেই।

সেলিয়া সবসময় পাশে পাশেই রয়েছে, তাই হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, আমার বউয়ের মতো ভাল বউ পৃথিবীতে আর কারো নেই।

ঘোড়ার গাড়ীতে আসার সময় সারা শরীরে জড়িয়ে ছিল ক্লান্তি। ঘুমে চোখ বুঁজে আসছিল। এখন আর তার ঘুম পাচ্ছে না। সব ক্লান্তি কোথায় চলে গেছে। মেজাজটাও হাসিখুশি। সেলিয়া মিষ্টি কুকী আর এক গ্লাস পানীয় হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। তখন মেয়েরা ঘরে নেই। তাকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করল, তোমার ব্যবসা কেমন চলছে?

যতক্ষণ তুমি আমার পাশে আছ, সবকিছুই ভালই চলবে।

আসলে উলফবার নিজের জীবিকার জন্য খুবই লজ্জিত। সমাজের অন্য মানুষগুলোর সঙ্গে নিজের তুলনা করতে গিয়ে খুবই ছোট মনে করে নিজেকে। সাধারণতঃ সেলিয়া কখনও তার পেশাগত ব্যাপার নিয়ে কোন কৌতূহল প্রকাশ করেনি। জানার ইচ্ছে হয়তো হয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন করতে চায়নি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সেলিয়া স্বামীর জীবিকা মন থেকে মেনে নিয়েছে। স্ত্রী আর মেয়েদের জন্য নতুন পোশাক তৈরি করতে হবে আসন্ন উৎসব উপলক্ষে। কোন দর্জি এত দেরীতে অর্ডার নিতে রাজী হবে কিনা সন্দেহ। এখন একটু ঘুমিয়ে নেওয়া ভালো। শরীরের ওপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। বিছানায় শুতে না শুতেই তার চোখে ঘুম এসে গেল।

ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখছে। লাবলিন শহরে আবার ফিরে এসেছে। যে ট্যানারীর কাজ ছেড়ে একদিন চলে গিয়েছিল আবার ঘুরতে ঘুরতে সেই ট্যানারীতে গিয়েই কাজ নিয়েছে। কাজের শেষে আধো অন্ধকার একটা ঘরে গামলা থেকে জল নিয়ে সে স্নান করছে। হঠাৎ দরজা খুলে যায়। সে দেখে দরজার সামনে পরচুলা পরা এক বিশ্রী চেহারার বুড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বুড়ির চোখের দিকে তাকাতেই

বুড়িটা রেগেমেগে চেঁচিয়ে উঠে বলল, আর কতক্ষণ ধরে চান করবে তুমি? সেই কখন বাথরুমে ঢুকেছ এখনও বেরোবার কোন ইচ্ছে নেই দেখছি। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এস। প্রেয়ারের সময় হয়ে গেছে। হঠাৎ চমকে ঘুম থেকে জেগে ওঠে উলফ। কি বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখেছে! কাঁচা চামড়ার দুর্গন্ধ এখনও তার নাকে লেগে আছে। এই গন্ধ অসহ্য, তাই জামার পকেট থেকে হাভানা চুরুট বার করে। চুরুটের গন্ধে দুর্গন্ধটা ঢেকে যাবে। যে রাশিয়ান ভদ্রলোককে জুয়ো খেলায় হারিয়ে দেড়শ রুবল জিতেছে সেই ভদ্রলোকই ওকে এই চুরুটটা দিয়েছিল। উলফ সাধারণত সিগারেট খায়। কিন্তু আধ রুবল দামের চুরুট খাবার জন্য বেশ একটা কৌতূহল তার মনের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। দেখাই যাক না চুরুট খেতে কেমন লাগে। তার মনে পড়ে হলুদ আর সোনালী রঙ মেশানো একটা সুন্দর সিগার-হোল্ডার কোথায় যেন রেখেছিল। হাভানা চুরুট খেতে সিগার-হোল্ডারটা ব্যবহার করাই ভাল। তাতে অনেক বেশী মেজাজ পাওয়া যাবে। কিন্তু সিগার-হোল্ডারটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। কোন কিছু হারিয়ে যাওয়া সে পছন্দ করে না। আলমারির সবকটা ড্রয়ার খোলে। প্রত্যেকটি ড্রয়ারের আনাচ-কানাচ হাতড়ায়। কাঠের সিন্দুক আঁতিপাঁতি করে খোঁজে। কিন্তু কোথাও পেল না। পোশাকের আলমারির ড্রয়ারে একটা টিনের বাক্স আছে। তার মধ্যে বার্থ সার্টিফিকেট, বিয়ের সার্টিফিকেট, মর্টগেজের কাগজ এবং অন্যান্য দলিল রাখা আছে। সিগার-হোল্ডার ওখানে থাকার সম্ভাবনা নেই। তবু যদি কখনও রেখে থাকে, এইভেবে বাক্সটা খুললো। সে অবাক হয়ে যায়। এ কী? এখানেও সিগার-হোল্ডারটা নেই। কিন্তু বাক্সের মধ্যে একটা নতুন জিনিষ খুঁজে পেয়েছে। বিয়ের সার্টিফিকেটের ওপর রয়েছে হীরে বসানো একটা ব্রোচ। মেয়েদের কাপড়ে আঁটার জন্য এই ধরনের সুন্দর কাজ করা পিন ব্যবহার করা হয়। উলফ পেশায় চোর সুতরাং তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। সে জানে এই ব্রোচের দাম কত হতে পারে। হীরকগুলো

আসল, ইমিটেশন নয়। ব্রোচটা বেশ পুরানো আমলের বলে মনে হচ্ছে। বাক্সের মধ্যে ওটা এল কোথা থেকে? নিজে আনেনি একথা ওর ভালোভাবেই মনে আছে। এত দামী গয়না সেলিয়ার কোনদিন ছিল না। তবে কি সেলিয়া সংসারের খরচ থেকে পয়সা বাঁচিয়ে ওটা কিনেছে? ও কোথা থেকে কিনবে? এই শহরে এত দামী গয়না পাওয়া যায় না। ব্রোচের উল্টো দিকে হুটো নাম খোদাই করা আছে। 'আলেফ' এবং 'গিমেল'। এই হুটো নামের সঙ্গে সে একেবারেই পরিচিত নয়। ব্রোচটা পকেটে রাখল। তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। এই ব্রোচের পেছনের রহস্য সমাধানের চেষ্টায় সে চোখ বুঁজল। চোখে আবার ঘুম নেমে এসেছে। ঘুমের মধ্যে আবার সেই স্বপ্নটা ফিরে এসেছে। লাবলিন শহরের সেই অন্ধকার ঘরে স্নান করছে। চারপাশে কাঁচা চামড়া ছড়ানো। ট্যানারীর কাজে প্রয়োজনীয় কেমিক্যালের হুর্গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে। মুখের চামড়া কোঁচকনো, এলোমেলো পোষাক আর পরচুলা পড়া সেই বিশ্রী বুড়িটা এসে আবার তাকে সাবধান করে দেয়, চান করতে এত সময় নিলে ধর্মানুষ্ঠানে যেতে দেরী হয়ে যাবে। তার ঘুম ভেঙে যায়।

রহস্যের সমাধান কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না। সেলিয়াকে কি কেউ উপহার দিয়েছে ব্রোচটা? কে দিতে পারে? সেলিয়ার এমন কে আপনজন আছে যে এত দামী উপহার দিতে পারে? আর যদি কেউ দিয়েই থাকে তবে সেলিয়া কেন গোপন করে রেখেছে?

ব্রোচের মধ্যে যে হুটো নাম খোদাই করা আছে তারা কেউ উলফের সঙ্গে পরিচিত নয়। তারা কেন সেলিয়াকে উপহার দেবে? ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে সে কাকাতুয়ার সঙ্গে কথা বলে। পাখি তুমি সব জানো, আমাকে সত্যি করে বলো তো ওরা কারা?

পাখির সেই একই কথা, বাবা, বাবা, বাবা। ভালবাসা, ভালবাসা, ভালবাসা।

পৃথিবীর বুকে গোধুলি নামছে। জানলার কাঁচ সবুজ হয়ে উঠছে। সূর্যাস্তের বেগুনী আলো এসে দেয়ালের ওপর পড়ে কাঁপছে। খাঁচার

মধ্যে ঢুকে যায় কাকাতুয়া। ঘরের মধ্যে অন্ধকারে একা বসে সিগারেট টানছে। বাড়িতে এখন কেউ নেই, সেই কখন দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছে সেলিয়া, এখনও ঘরে ফেরার নাম নেই। কিন্তু ফিরতে এত দেরি করছে কেন ? মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ার আগে সেলিয়াকে কিছু বলা সম্ভব নয়। একটু পরে বাইরে থেকে ওদের গলার শ / ও পায়ের শব্দ কানে ভেসে এল। সেলিয়া ফিরে এসেছে। তিনজনের হাতেই অনেকগুলো প্যাকেট। ওরা লাফাতে লাফাতে ঘরে এসে ঢুকলো। মেয়েদুটো খুশীতে ডগমগ। সেলিয়ার মুখে খুশীর হাসি ছড়িয়ে বললো, তুমি এই অন্ধকারে একা ঘরে বসে সিগারেট টানছো ?

এক রাশিয়ান ভদ্রলোক ট্রেনে আসার সময় আমাকে এটা দিয়েছে।

চুরুটের গন্ধ আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। আমার প্রচণ্ড মাথা ঘোরে। আজ আমরা তিনজনে মিলে কত দোকান ঘুরে ঘুরে জিনিস কিনেছি। তোমাকে দেখাচ্ছি, দাঁড়াও আগে আলোটা জ্বালাই।

কেনাকাটার ব্যাপারে কোনরকম কৌতূহল প্রকাশ না করে বলল, আমার একটা তৈলস্ফটিকের তৈরি সিগার-হোল্ডার ছিল। ওটা কোথায় রেখেছি তুমি বলতে পারো ?

কি জানি।

প্যাকেট হাতে মেয়েরা লাফালাফি করছে। টেবিল ল্যাম্প ও ছাদ থেকে ব্রোঞ্জের চেনে ঝোলানো আলো জ্বাললো সেলিয়া। জিনিসপত্র দেখে তেমন কোন মন্তব্য করল না উলফ। এখন এ ব্যাপার নিয়ে সময় নষ্ট করতে চায় না।

খাওয়ার টেবিলে বসে সেলিয়ার রান্নার প্রশংসা করল। আর কোথাও খেয়ে এত তৃপ্তি পায় না। কতদিন পর তৃপ্তি করে খাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। মেয়েদের সঙ্গে হাসিঠাট্টাও করল কিছুক্ষণ। সবকিছুই করছে কিন্তু কেমন যেন নিয়মমাফিক। এখন সে আর আগের মতো হাসিখুসিতে ভরা নেই। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নিতে

চাইছে, তাই বেশি খাবার নিলনা। খাওয়ার মাঝে মাঝে সে সেলিয়ার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখছে। চা, জ্যাম ও কেকগুলো খাওয়া শেষ হলে সে মেয়েদের বললো, এবার তোমরা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। তাড়াতাড়ি ঘুমাবে আর ভোরবেলায় উঠবে।

উলফ নিজেও চলে এল বেডরুমে, স্লিপিং ড্রেস পরে নিয়ে সে বিছানার ওপর বসল। সেলিয়া সংসারের কাজ শেষ করে তবে ঘরে আসবে। ওর সঙ্গে জরুরী কিছু কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। সেলিয়া ঘরে ঢুকেছে, উলফ তখন গম্ভীর মুখে ওর দিকে তাকালো। সেলিয়া প্রশ্ন করে, তুমি আমাকে কিছু বলবে বলে মনে হচ্ছে?

ব্রোচটা বালিসের তলা থেকে বের করে উলফ জিজ্ঞেস করলো, এটা তুমি কোথা থেকে পেয়েছ?

সেলিয়া ভাবতেই পারেনি ব্রোচটা ওর হাতে গিয়ে পড়বে। সেলিয়া কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। প্রশ্ন শুনেই চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। আস্তে আস্তে চোখ তুলে উপরের দিকে তাকালো। তার মুখের চেহারা বদলে গেছে। তার দৃষ্টিতে বিস্ময়ের প্রকাশ আর মুখ গম্ভীর। উত্তর না দিয়ে রেহাই নেই, খুব নীচু স্বরে বললো, ওটা অনেকদিন ধরে আমার কাছে আছে।

কোথায় পেয়েছ?

সেলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারলো না। খানিকক্ষণ চুপ করে আকাশপাতাল ভাবতে থাকে। একটা উত্তর খুঁজে পেয়েছে, ও নিজেই জানে কথাটা কেউ বিশ্বাস করবে না, তবু বললো, কুড়িয়ে পেয়েছি।

কোথায়?

সিনাগগের মহিলা বিভাগে।

তুমি কি প্রায়ই সিনাগগে প্রার্থনা করতে যাও?

প্রায়ই যাই না। সেদিন গিয়েছিলাম। রোশ হাশানার উৎসব ছিল।

কুড়িয়ে পেয়ে তুমি জানতে চাইলে না ব্রোচটা কার?

না।

তুমি আমাকেও বললে না ?

তোমাকে সবকিছু বলবো কেন ?

ব্রোচে দুটো নাম খোদাই করা আছে আমি দেখেছি। আলেফ আর গিমেল, এবার তুমি বলবে ব্রোচটা কার ?

সেলিয়া দরজার দিকে তাকায়, দরজা ভেজানো আছে। কথা-গুলো যেন মেয়েদের কানে গিয়ে না পৌঁছায়। ওরা কি এখনও জেগে আছে ? পাশের ঘর থেকে এখন কোন কথার শব্দ ভেসে আসছে না। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে উলফের দিকে তাকায়। সেলিয়ার চোখের দৃষ্টিতে উদ্ধত ভাব লক্ষ্য করে উলফ। সেলিয়া বলে, তুমি আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলছ কেন ? তুমি কি অ্যাটর্নী ?

ওটা কার, সত্যি করে বলো।

চেঁচিও না। ব্রোচটা আলেফ গিমেলের।

মনে পড়েছে। হ্যানুক্কার উৎসবে সিনাগগে লোকে লোকারণ্য। এক সময়ে শোনা গেল আলেফ গিমেলের ব্রোচটা হারিয়ে গেছে। চারদিকে খোঁজাখুঁজি করে কোথাও তার সন্ধান পাওয়া যায়নি ! এই নিয়ে সারা শহর জুড়ে খুব চেঁচামেচি হয়েছিল। এবার বলো তো ব্রোচটা তোমার হাতে কি করে এল ?

আমি রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছি।

একটু আগে বলেছ সিনাগগে, সত্যি করে বলবে কোথায় পেয়েছ ?

আগে ভুল বলেছি, আর ভুল বললে এমন কি ক্ষতি হয়েছে ?

ডেবোরা লীর বিয়ের উৎসব ছিল সেদিন। ব্রোচটা সেদিন হারিয়েছিল আলেফ গিমেল। সেই উৎসবে তুমিও যোগ দিয়েছিলে। সবাইকে সার্চ করা হয়েছিল, কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে ওটা ?

তুমি আমাকে এমনভাবে প্রশ্ন করে নাজেহাল করতে চাইছ যেন নিজে খুব সাধু।

তাহলে তুমি চুরি করেছ তাই না ?

তুমি যদি চোর হতে পারো, চুরি করা যদি তোমার জীবিকা হতে

পারে তাহলে আমার চুরি করতে বাধা কোথায়? আর তাই নিয়ে এত চেঁচামেচি করার কি আছে? এই শহরের সবাই জানে তুমি চোর। আমাদের মেয়েদের নিয়ে সবাই ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে। ওদের স্কুলের শিক্ষকরা পর্যন্ত ঠাট্টা করে। কোন মেয়ে কিছু হারালে মানা আর অ্যানকাকে ওরা সন্দেহ করে। ওদের স্কুলের ব্যাগ তন্ন তন্ন করে খুঁজে না পেলেও ওদেরকে বলে, হাত সাফাইয়ের কাজ বাপের কাছ থাকে ভালই শিখেছ দেখছি। তুমি শুনে দুঃখ পাবে বলে আমি এতদিন তোমায় কিছু বলিনি। কিন্তু প্রতিদিন তোমার জন্য সকলের কাছে আমাকে অপমানিত হতে হয়। এখন তুমি সাধুতা দেখাতে চাইছ? আমি যদি সত্যিই সতী সাধ্বী হতাম, আমি তোমাকে কিছুতেই বিয়ে করতাম না, একথাটা আমি তোমাকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলাম।

ওটা কিভাবে চুরি করলে?

ওর ঢিলে জামার কলার থেকে খুলে নিয়েছিলাম, ও অন্য সকলের সঙ্গে কথা বলতে এতই মশগুল ছিল যে আমার কাজটা সারতে কোন কষ্ট হয়নি। কেউ টের পায়নি। কথাটা তুমি হয়তো বিশ্বাস করতে পারছো না, কিন্তু ওর অন্যমনস্কতার সুযোগটাই আমি নিয়েছিলাম। কাজটা কেন করেছিলাম আমি নিজেই জানি না। অনেক বছর ধরে ওটা টিনের বাক্সের মধ্যে রয়েছে আজ হঠাৎ তুমি কেন আমার ব্যাগ হাতড়াতে গেলে?

আমি আমার সিগার-হোল্ডার খুঁজছিলাম।

তোমার সিগার-হোল্ডার আমি নিইনি।

আর কোন প্রশ্ন করল না উলফ। চুপচাপ বিছানায় ওপর সোজা হয়ে বসল। মুখটা গম্ভীর। তার রাগ হয়নি, খুবই দুঃখ পেয়েছে। কোন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ কেউ গোপন করে রেখেছিল, আজ যেন হঠাৎ সে জানতে পেরেছে। এতদিন সে জানতো সেলিয়া খুব ভাল মেয়ে। সে চোর, ভাল পরিবারের ভাল মেয়েকে বিয়ে করার জন্য নিজেকে অপরাধী বলে মনে করে। অনেকবার এইজন্য

অপমান সহ্য করতেও হয়েছে। মাঝে মাঝে সেলিয়া বলেছে, তোমার জীবিকা ভাল নয়। শহরের লোকেরা আমাকে এড়িয়ে চলে। আমি তাদের সঙ্গে মিশতে চাইলেও আমাকে অবজ্ঞা করে চলে যায়। আমি চাই মেয়েরা যেন ভাল শিক্ষা পেয়ে ভাল হয়, বড় হয়। তোমার জন্য ওদের জীবন যেন নষ্ট না হয়। কয়েকবছর আগে ইয়ানোতে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। অপরাধ প্রমাণিত হলে দীর্ঘমেয়াদী শাস্তির সম্ভাবনা। কিন্তু সেলিয়া ইয়ানোতে গিয়ে তাকে ছাড়িয়ে আনে। সেলিয়া বলেছে ওকে ছাড়ানোর জন্যই সে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নীর সঙ্গে দেখা করে কান্নাকাটি করেছিল। অ্যাটর্নী তাকে কাঁদতে দেখে এইটুকু করুণা করেছিল। জীবনে অনেক প্রলোভনের মধ্যে পড়েও সে বলেছে, কোজলো শহরে তার স্ত্রী আর দুই মেয়ে আছে। এমন সুখের সংসার সে নষ্ট করতে চায় না। সে বারবার জেলে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েছে যাতে সেলিয়ার কোন কষ্ট না হয়। অভাবের মধ্যে থাকলে মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়। তাই সে সবসময় চেষ্টা করেছে ওদের জীবন থেকে অভাব দূর করতে। সেলিয়াকে আজ নতুন করে চিনতে পেরেছে। আজকের এই ঘটনা যেন হঠাৎ তার বয়স বাড়িয়ে দিল। সেলিয়া আর কোন কথা বলতে চায় না। তাই সে বলল, আলোটা কি নিভিয়ে দেব ?

উলফ কোন উত্তর দিল না। আলো নিভিয়ে নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল সেলিয়া। কারো মুখে কোন কথা নেই। আশ্চর্য শীতল একটা অনুভূতি পাথরের মতো তার বুকের ওপর চেপে বসে আছে।

তুমি কেন চুরি করতে গেলে সেলিয়া ? ব্রোচটা কি তোমার খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ?

এসব প্রশ্ন তুমি আমাকে কেন করছ ?

কেন করছি তা তুমি ভাল করেই বুঝতে পারছ। আমার কাছে তুমি বদলে যাও আমি চাই না।

তোমার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

হাত পা ছড়িয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ে উলফ। পাশের ঘরে মেয়েরা ফিসফিস করে কথা বলছে আর হাসাহাসি করছে। বাইরে বসন্তের হাওয়া বইছে। জানলার শাটারগুলো কাঁপছে বাতাসে। জানলার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো আসছে ঘরে। সেলিয়া চুপ করে শুয়ে আছে। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। বাড়িতে ফেরার সময়ে পরিবারের মানুষগুলোর জন্য মনের মধ্যে যে ভালবাসা স্থান করে নিয়েছিল তা যেন কোথায় উবে গেছে। সব শেষ হয়ে গেল। এত বছরের সুখ হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। মনের গভীরে কে যেন এসে শোক জানাতে চায়। ট্রেনে ট্রেনে ঘুরে বেড়ানো, সস্তা সরাইখানার নোংরা বিছানায় শুয়ে রাত কাটানো, মেলায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চুরি করা—এসব করেছে দিনের পর দিন কাদের জন্য ?

উলফ নিজের মনে ফিসফিস করে, নিজেই সান্ত্বনা খোঁজে। আমার বউ চোর ; তাই আমাকে ভাল মানুষ হতে হবে। একই পরিবারের দুটো চোরের ঠাঁই নেই।

এমন এক অদ্ভুত ভাবনা মাথায় আসতেই নিজেই ঘাবড়ে যায় উলফ। কিন্তু সে বুঝতে পারে এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কিছুক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকার পর বিছানা থেকে উঠে মেঝের ওপর দাঁড়ায়।

সেলিয়া প্রশ্ন করে, তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ ?

লাবলিন শহরে।

সেখানে গিয়ে তুমি কি করবে ?

আমি ট্যানারীতে কাজ করবো। পুরনো জীবিকা আমাকে ছাড়তেই হবে।

গণ্ডারের চামড়া সৃষ্টির রহস্য

রুডিয়ার্ড কিপলিং

অনেক অনেকদিন আগের কথা। লোহিতসাগরের তীর। সেখানকার জনমানবহীন অঞ্চলে এক পারসীর বাস ছিল। পারসী তো পারসী। মনে ছিল তার অগাধ সুখ। তা ধিন ধিন ঘুরতো আর কেক বানিয়ে খেতো।

পারসীর ঘরে অনেক জিনিসপত্তর ছিল। সেগুলো অগছালো-ভাবে যেখানে সেখানে অবিন্যস্তভাবে পড়ে থাকতো। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় তার যে জিনিসগুলো তা হল—একখানা ছুরি ও একখানা রান্না করে খাওয়ার স্টোভ। কিন্তু আরো একটা জিনিসের কথা বাদ রয়ে গেল। সেটার কথা জানিয়ে দেওয়াও দরকার। সেটা হল টুপি।

একদিন বাড়িতে বসে বসে ভাবছিল পারসী। কত রকম সেসব ভাবনা। হঠাৎ মনে এলো তার আজ সে আবার একখানা কেক তৈরি করবে। অবশ্য এই কেকটা আর পাঁচটা কেকের মতন হবে না। এর সাইজ বা আকার হবে বিরাট। হবে ভীষণ মোটা। যা আর কেউ কোনদিন বানায়নি।

ভাবনা তো ভাবনা। সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল তার নতুন কেক তৈরির কাজ। কেক তৈরি করতে যা যা দরকার সবই সে হাতের কাছে নিয়ে এলো। তারপর ভালো করে বসলো কাজ শুরু করতে।

প্রথমে ময়দার সঙ্গে জল ঢেলে সেগুলো মাখতে লেগে গেল। পরে চিনি এবং কিশমিশ দিয়ে আচ্ছা করে মিশিয়ে নিলো। যখন ময়দা ভালো করে মেশানো হয়ে গেল, পারসী সেগুলো আগুনে সেঁকার জন্য তৈরি হলো। সেঁকতে সেঁকতে সে দেখলো ময়দার তৈরি কেক ধীরে ধীরে বাদামী বর্ণ ধারণ করছে এবং তার থেকে একটা

মধুর গন্ধ ভেসে আসছে। গন্ধ শুঁকে পারসীতো মৌ মৌ খুশি। কখন কেকটা পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবে সেই চিন্তাতেই সে ছটফট করছিল। জিব থেকে ঝরছিল নতুন লালা।

অবশেষে কেক গড়া হয়ে গেলে পারসী সেটা হাতে নিয়ে খেতে বসলো। যেই বিরাট কেকটাতে মুখ দিতে যাবে অমনি সেখানে ঘটলো এক অভাবনীয় কাণ্ড। একটা নাদুস নুদুস গণ্ডার সেখানে শরীর মোচড়াতে মোচড়াতে হাজির হলো। প্রকাণ্ড সেই প্রাণীটাকে দেখে পারসী তো থ! কী করবে সে?

ভয়ে জড়েসড়ো হয়ে পারসী কাঁপতে শুরু করলো। তাই দেখে গণ্ডার আরো পেয়ে বসলো। দুষ্টুমি শুরু করে দিলো। দুষ্টুমি করতে করতে এমন জোরে একটা চিৎকার করলো যেন কানে তালা লাগার জোগাড়। পারসী এবার ভয়ে চিড়ে চ্যাপ্টা। কেক-টেক ফেলে দে দৌড়। ছুট তো ছুট। এক ছুটে একেবারে তালগাছের মাথায়।

দুষ্টু গণ্ডার আরো সুযোগ পেয়ে গেল। শুরু করে দিল হম্বিতম্বি। দুষ্টু ছেলেদের মতন লাথালাথি আরম্ভ করলো। শিং দিয়ে উল্টে দিলো পারসীর সখের স্টোভটা। এইসব করতে করতে বাদামী কেকটার ওপর গিয়ে নজর পড়লো গণ্ডারের। একটু আশ্চর্য্য হয়ে কেকটার কাছে ছুটে গেল। ভালো করে শুঁকে দেখলো। ভারী মিষ্টি তো! খেলে তো হয়! যা ভাবা তাই করা। গপাগপ মিষ্টি কেকটা এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলল।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে গণ্ডার ভাবল এবার কি করা যায়! না, এখানে আর নয়। তারচেয়ে বরং একটু নিরালায় গিয়ে বিশ্রাম করা যাক। তাই সেখান থেকে পাজী গণ্ডারটা সরে পড়লো। ধীরে ধীরে নির্জন দ্বীপের আরো ভিতরে ঢুকে গেল। যেখানটায় ম্যাজানজরেণ, সকোত্রা, বৃহত্তর কিউনেক্সের মালভূমি সৃষ্টি হয়েছে।

গণ্ডার চলে গেলে পারসী তালগাছের মাথা থেকে সুড় সুড় করে নেমে এলো। রাগে গা জ্বলছে তার। ফুঁসতে ফুঁসতে এসে

প্রথমেই তার ষ্টোভটা সোজা করে বসালো। কেকের চিহ্ন নেই। ক্ষিদেও পেয়েছে। সবকিছু মিলে তার চোখমুখের চেহারা পাল্টে গেছে। মনে মনে সে গুমরে উঠছে। প্রতিশোধ নিতেই হবে। গণ্ডারটা যেভাবে তাকে অপমান করেছে তা সহ্যের সীমা লঙ্ঘন করেছে। সুতরাং প্রতিশোধ নিতেই হবে। এবং কেমন ভাবে নিতে হয় সে সেসব ভালকরেই জানে। পাঁই পাঁই করে সে পাক খেতে শুরু করে দিলো। ঘুরে ঘুরে পড়তে লগেলো মন্ত্র। সে এক অদ্ভুত মন্ত্র। শুনলে হাসি পায়। হাসি পেলে হবে কি, পারসী তো নেচে নেচে বলেই চলেছে—

আমি এক পারসী
বানিয়েছি কেক
খাবে কে কে চলে এসো
নয় কোন চেক
বানিয়েছি কেক।
বলে রাখি ভাই সব
খাও যদি কেক
ভুল তো করবেই তুমি
বনে যাবে ভেক
বানিয়েছি কেক।

এবারের ঘটনা একটু অন্য রকম। হয়তো প্রথম প্রথম অনেকের বিশ্বাস পর্যন্ত হবেনা। আর আমরা তো এমন ঘটনা কখনো কেউ শুনেছি বলে মনে হয় না।

ঠিক পাঁচ সপ্তাহ পরে একদিন লোহিতসাগরের পাড়ে প্রচণ্ড গরম পড়ে। গরমে সবাই অস্থির হয়ে উঠছে। এই সময় জামাকাপড় পরে থাকাও যায় না। তাই যার যা পোশাক ছিল গায়ে সবাই খুলে ফেলতে শুরু করলো।

গরমে পারসীর আঁইটাঁই অবস্থা। আস্তে আস্তে সে তার মাথা থেকে টুপি খুলে ফেললো। গণ্ডারও তার গা থেকে চামড়া

খুলে ফেললো। এইবার সবাই সমুদ্রের জলে স্নান করার জন্য নেমে গেল। তোমাদের জানিয়ে রাখি, আশ্চর্য হবে না কিন্তু, আসলে তখনকার দিনে গণ্ডারের পেটের নিচে ছোট ছোট বোতাম থাকতো। এই বোতাম খুলে ফেললেই গণ্ডারের গা থেকে চামড়া বেরিয়ে আসতো।

যাইহোক গণ্ডারও সোজা গিয়ে জলে নামল। নেমেই নাক উঁচু করে বুদবুদ কাটতে লাগল জলে। পারসীকে সে গ্রাহ্যই করলো না।

এইমুহূর্তে পারসীর মনে মনে হাসি পেল। কেননা তার মাথায় এক বুদ্ধি জেগেছে। ঘন ঘন সে গণ্ডারের খুলে রাখা চামড়াটার দিকে তাকাতে লাকলো। ভাবলো গণ্ডারটাকে এবার জব্দ করতে হবে। যা ভাবা তাই কাজ। নিঃশব্দে সে জল থেকে উঠে তাঁবুতে প্রবেশ করলো। তারপর তার টুপিতে কেকের গুঁড়ো ভর্তি করে ফেললো। আর মনে মনে সে ভেবেই চলেছে নিশ্চয়ই এবার গণ্ডারটাকে মুশকিলে ফেলা যাবে। বুঝবে মজা তখন। পারসীর তাঁবুতে গুড়ো কেক যেখানে সেখানে পড়ে ছিল। নোংরা অপরিষ্কার তাবু। সব গুড়োগুলো সে এক জায়গায় জড়ো করলো। তারপর মাটি থেকে গণ্ডারের চামড়াটা তুলে নিয়ে এসে তার মধ্যে কেকের গুড়ো ছিটিয়ে দিলো। কয়েকটা পোড়া কিশমিশের দানাও চামড়ার মধ্যে দিয়ে দিলো। এইভাবে কাজটাজ শেষ করে পারসী তালগাছের মাথায় গিয়ে চড়ে বসলো। গণ্ডার কখন উঠে আসে এবং কি করে তাই দেখার জন্য অবশ্য চামড়াটা যে জায়গায় ছিল ঠিক সেখানেই সে আবার রেখে দিয়ে এসেছিল।

গণ্ডার চানটান সেরে ডাঙায় উঠে এলো। তারপর ধীরে ধীরে চামড়টা শরীরে ঢুকিয়ে বোতাম লাগাতে শুরু করলো।

এরপর যা ঘটলো তা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। তোমরা আশ্চর্য যেমন হবে হাসবেও।

যখন চামড়াটা পুরোপুরি পরা হয়ে গেল গণ্ডার তো কাতুকুতুতে

বাঁচেনা। অনবরত ঐ গুড়োগুলো তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে চললো। ফলে গণ্ডার ছটফট শুরু করে দিলো। যতই সে গায়ের চামড়াটা ধরে টানাটানি করে আরো বেশি করে তার কাতুকুতু লাগে। গণ্ডার একেবারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠছে। কি করবে ভাবতে পারছে না। ওদিকে টানাটানিতে পেটের বোতামগুলো জোরে আটকে যাচ্ছে। এবার সে মাটিতে শুয়ে গড়াগড়ি দিতে শুরু করে দিলো। কিন্তু যতই গড়াগড়ি খায় কাতুকুতুর পরিমাণটা ঠিক ততটাই বেড়ে ওঠে। কোনভাবেই কিছু হচ্ছে না দেখে গণ্ডার এবার তালগাছে গিয়ে জোরে জোরে গা ঘষতে শুরু করে দিলো। ফল হলো আরো ভয়ঙ্কর। গণ্ডারের কাঁধের চামড়ায় পড়লো বিরাট বিরাট সব ভাঁজ। পেটেও বড় একটা ভাঁজ দেখা গেল। আশ্চর্য পায়েও ঐরকমই ভাঁজ পড়লো একখানা।

এভাবেই গণ্ডারের রাগ ভীষণ বেড়ে গেল। আর রাগ হবে না; কার না হয় এমন পরিস্থিতিতে। আজও আমরা গণ্ডারের সেই মেজাজের পরিচয় পাই। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় এই প্রাণীটা কত রাগী। সুতরাং সবার জানা হল, গণ্ডারের রাগ সৃষ্টি হল কিভাবে আর তার চামড়ায় বা এমন করে ভাঁজ পড়লো কেমন করে।

আর পারসীটা কি করলো? সে কথা নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করে? এখন গাছ থেকে নেমে এলো পারসী। নেমে এসেই তার টুপিটা মাথায় পরে নিলো। রান্নার জন্য যে স্টোভটা ছিল সেটা ঠিকঠাক করে নিলো। আর কি করা, যাত্রা শুরু করলো দূর দেশের উদ্দেশ্যে। তারপর ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল দূরের অরোটাভো, এ্যামাইগ্যালা, এ্যানটানানারিভোর পর্বতমালার দিকে যেখানে রয়েছে সোনাপুটের বিস্তৃত জলাভূমি।

উদ্বাস্তু

পাল বার্ক

নতুন গড়ে ওঠা রাজধানীর বুক চিরে ওরা চলেছে। অনেকেই বিদেশী বলে ওদের ভুল করবে। কিন্তু ওরা এদেশেরই মানুষ। এখন ব্যবধানটুকু বড্ড বেশি মনে হলেও এখান থেকে ওদের ভিটেমাটি মাত্র কয়েক শ মাইল দূরে।

ওরা হেঁটে চলেছে। ওদের চোখে-মুখে একঝাঁক বিস্ময়। যেন অকল্পনীয়ভাবে ওদের এই ছিটকে যাওয়া। হঠাৎ-ই ওদের সুখ-স্বর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া।

গ্রাম্য পরিবেশে ওরা মানুষ। গ্রামের পথ, মাঠ, প্রকৃতির মধ্যে ওরা মিশে ছিল ওতপ্রোতভাবে। দু'চোখ মেলে নতুন রাজধানীকে উপভোগ করার সুযোগ তাদের হয়নি। আজ তাই গর্বিত রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্বভাবতই ওদের মনে নানা প্রশ্ন উঁকি ঝুঁকি দেবার কথা। তবু কোন আশ্চর্য জিনিস ওদের প্রশস্ত হৃদয়ে ছাপ ফেলতে পারছে না। পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে বিস্ময়কর মোটরগাড়ি কিংবা কোন দর্শনীয় বস্তুর গা ঘেঁষে ওরা ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। তথাপি কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুই ওদের এক মুহূর্তের জন্য থামাতে পারছে না। আসলকথা এখন কোন দিকেই তাকাবার সময় ওদের নেই। আর মনের অবস্থাটাও ওদের ভাল নয়।

ওদের সংখ্যাটা নিতান্ত কম নয়। শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে ওরা চলেছে। কোন দিকেই ওরা তাকাতে ভুলে গেছে। ওদের দিকেও কেউ তাকাচ্ছে না। এই দৃষ্টিনন্দন রাজধানী-শহর এখন উদ্বাস্তুভারে জর্জরিত। হাজার হাজার শরনার্থীকে শহর চৌহদ্দীর বাইরে তৈরি অস্থায়ী শরনার্থী শিবিরে কোনরকমে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে জীবন ধারণের ব্যবস্থাটুকুও করা হয়েছে।

সারাদিন ধরে ওরা আসছে। এগিয়ে চলেছে শরনার্থী শিবিরের দিকে। ওদের বেশির ভাগই নারী ও পুরুষ হলেও কিছু শিশু রয়েছে। শহরবাসীরা ওদের দেখে নাক সিটকাতে থাকে। কোন শহরবাসী বিরক্তভাবে বলে ওঠে—'এত উদ্বাস্তু, এদের কি কোন শেষ নেই? এদের যদি এক কণা করেও খাওয়াতে হয় তবে আমরাইতো শেষে না খেয়ে মরব।'

এ আশঙ্কা কোন শহরবাসীর একার নয়। সবারই মনের অবস্থা ভীষণতর। তাদের এই তিক্ততা ও বিরূপতার মূলে রয়েছে ভয়। এই ভয় থেকেই শহরবাসীরা ওদের প্রতি বিরূপ মনোভাবপন্ন হয়েছে।

ছোট ছোট দোকানীরা আরো নির্দয় হয়ে উঠেছে। ঘন ঘন আসা ভিখারীদের ভিক্ষা দিচ্ছে না। বরং তাড়াবার জন্য তারা উৎসুক হয়ে রয়েছে। রিক্সাওয়ালা এখন ভাড়া পাচ্ছে না। উদ্বাস্তুরা এখন তাদের জীবিকার শরিক হয়েছে। ওরা পেশাগত রিক্সাচালকদের অভিশাপে জর্জরিত। তাদের রুজি রোজগারে ভাটা পড়েছে। কখনও কখনও অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটছে।

নানকিং এখন উদ্বাস্তু শহর। দরজায় দরজায় ভিক্ষাপাত্র হাতে ওরা। অফিস আদালতের চত্বরেও ওদের ভিড় বাড়ছে। যদি কিছু কাজ মিলে যায় সেই আসায়। কিংবা শ্রমের বদলে কিছু খাদ্য।

এই গোধূলী বেলায় যে নতুন উদ্বাস্তুর দলটি এখন শহরে ঢুকছে ওদের কপালে কি লেখা আছে কেউ জানে না। হয়ত আগামী কোন শীতের সকালে ওদের অস্তিত্বই বিলীন হয়ে যাবে। হয়ত কোন বরফজমা রাস্তার ওপরে ওদের সংগ্রামী দেহটা পড়ে থাকবে। এটাই বোধ হয় ওদের ললাটের লিখন।

ওরা সেরকম সমাজের মানুষ নয়, যারা বন্যার সময় নিয়মিতই উপোষী থাকতে অভ্যস্থ বরং ওরা সেই সমাজেরই অংশ যাদের জন্য কোন জাতি গর্ব করতে পারে। ওদের পোশাক পরিচ্ছদই জানিয়ে দেয় যে ওরা সকলেই একটা বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসী। কারণ

ওদের সকলেরই পরণে গাঢ় নীল রঙের, লম্বা হাতাওয়ালা, পুরনো ঢঙের পোশাক। পুরুষদের পরণে বিচিত্র কারুকার্য করা বেশরক্ষনী আর মহিলাদের সেই একই কাপড়ের তৈরী শিরাচ্ছাদন। মেয়েদের পায়ের প্রায় সমস্তটাই ঢাকা থাকলেও অতি সহজেই বোঝা যায় যে এই পুরুষ এবং মহিলাগণ সকলেই দীর্ঘাঙ্গী এবং মজবুত শারিরীক গঠনের অধিকারী। বিশাল দলটির মধ্যে কয়েকজন কিশোরকে দেখা যাচ্ছে এবং কয়েকটা শিশুও তাদের বাবার কাঁধে করে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে বাহিত হচ্ছে। কিন্তু ওদের মধ্যে কোন সদ্যজাত শিশু বা যুবতীর দেখা মেলা কঠিন। প্রত্যেকেরই কাঁধে কিছু না কিছু বোঝা। এগুলোর বেশির ভাগই তাদের প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র লেপ-কাঁথা ও জামাকাপড়। এগুলোর সবই মজবুত এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেকটা ভাঁজ করা লেপের ওপর একটা মাদুর ও একটা কড়াই রয়েছে। কড়াইগুলোর চেহারাই জানান দিচ্ছে যে হঠাৎই কোন জ্বলন্ত উনুন থেকে সেগুলোকে তুলে আনা হয়েছে। তাদের এতগুলো বোঝার মধ্যে কোথাও কিন্তু একটুও খাবারের চিহ্ন নেই।

এই গোধুলির প্রথম দর্শনে ওদের বেশ বিত্তশালীই ভ্রম হতে পারে, কিন্তু খুব কাছ থেকে দেখলেই বোঝা যায় যে এই উপোষা মুখের মিছিল ধীর, হতাশ গতিতে এগিয়ে চলেছে তাদের শেষ আশার দিকে। রাস্তার দুদিকের কোন দৃশ্যই ওদের চোখে রঙীন হয়ে ধরা পড়ছে না কারণ মৃত্যু ওদের পিছু নিয়েছে। বন্যা-তাড়িত হয়ে এখানে আসার আগে পর্যন্তই ওদের গণ্ডগ্রামে পড়ে থাকলেও অভূতপূর্ব বিজ্ঞানের এই অত্যাধুনিক দানগুলো তাদের দৃষ্টি এতটুকুও আকর্ষণ করতে পারেনি। কারণ ওরা জানে যে ওদের মত মৃত্যু-পথযাত্রী মানুষ-গুলো শুধু শহরবাসীদের কাছেই নয়, জীবনের কাছেও অপাংক্তেয়।

যে বিশাল দলটি চলেছে তার শেষের মানুষটি একজন বেঁটেখাঁটো, বিশীর্ণ বৃদ্ধ। বৃদ্ধ হলে কি হবে, প্রকৃতি ওকেও রেহাই দেয়নি, ওকেও কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে বাঁকে ঝোলানো দুটো বোঝা। এই

বোঝা দুটোও সেই নতুনত্বহীন লেপ-কাঁথা, কড়া মাদুরের সমাবেশ। বৃদ্ধর লেপটা জীর্ণ কিছু পরিষ্কার। লেপ-কাঁথার এই বোঝা দুটো হালকা হলেও তা বুড়োটার পক্ষে যথেষ্টই। বুড়োকে দেখলেই বোঝা যায় যে সাধারণ সময়ে তাকে কখনই এতটা পরিশ্রম করতে হত না, কিন্তু পরিস্থিতি তাকে এই অবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। শক্তির শেষ বিন্দুগুলো দিয়ে সে হেঁটে চলেছে আর শ্বাস প্রশ্বাস সশব্দে প্রবাহিত হচ্ছে। যন্ত্রণাকাতর রেখাঙ্কিত মুখের চৌহদ্দাতে আটকে থাকা, ছোট চোখদুটোর দৃষ্টি বহু কষ্টে সম্মুখে প্রসারিত, কারণ সামনের জনেরা তাকে ছেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সে উদ্বিগ্ন। এককথায় বৃদ্ধের অবস্থা খুবই করুণ।

হঠাৎ বৃদ্ধের গতি স্তব্ধ হল। অতি সন্তর্পনে বোঝাদুটোকে নামিয়ে সে মাটিতে বসে পড়ল। হাঁটু দুটোর মধ্যে মাথা রেখে, চোখ বুজে হাঁপাতে লাগল। উপোষী বৃদ্ধের দু'চোয়াল রক্তাভ। একজন ছিন্ন বস্ত্র, অতি দরিদ্র নুডলস্ বিক্রেতা কাছেই তার পসরা সাজিয়ে বসেছে আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে খদ্দের ডাকছে। তার দোকান থেকে একঝলক আলো বৃদ্ধের ক্রমনিমজ্জমান দেহের ওপরে আছড়ে পড়েছে। এক দয়ালু পথিক বৃদ্ধের কাছে এসে দাঁড়াল এবং স্বগতোক্তি করল, 'আজ আমার পরিবারের সকলকেই যদি শুধু নুডলস্ খাইয়ে রাখি তাহলেও এই বৃদ্ধকে দেওয়ার মত কিছুই আমার কাছে থাকে না। ঠিক আছে, আমি ওকে আমার আজকের উপার্জিত রৌপ্যমুদ্রাটাই দিয়ে দেব তারপর কালকের ভাবনা কালকে ভাবা যাবে। আমার বৃদ্ধ পিতা জীবিত থাকলেওতো খাওয়াতে হত।'

পথিকটি তার ছিন্ন কোমরবন্ধের মধ্যে অনেক হাতড়ে শেষে একটা রৌপ্যমুদ্রা পেল এবং কিছুক্ষণ দ্বিধার মধ্যে বিড় বিড় করার পর একটা তাম্রমুদ্রা তাতে যোগ করে তিক্ত আন্তরিকতার সঙ্গে বল্লেঃ —'ওহে বৃদ্ধ পিতা, এই দুটো নিয়ে নুডলস্ কিনে খাওতো দেখি।' পথিকের কথা শুনে বৃদ্ধ হাঁটুর ভেতর থেকে মন্থর ভাবে মাথাটা তুলল।

কিন্তু মুদ্রাদুটো দেখে লোভীর মত হাত না বাড়িয়ে তার সদ্য অতীতের কিছু ঘটনা বলে গেল ঃ

'মশায়, আমিতো আপনার কাছে ভিক্ষা চাইনি। জানেন, আমাদেরও উর্বর জমি ছিল, প্রচুর ফসলও ফলত। এখনকার মত আর কখনই আমাদের অনাহারে থাকতে হয়নি। নদী এবছর ফুসে উঠল, জমি প্লাবিত হল, আর আমরা উপোষ করতে বাধ্য হলাম। এমন অবস্থা হল যে আমরা বীজধান পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছি। ওদের আমি কত নিষেধ করলাম, কিন্তু ক্ষুধার্ত যুবকগুলো আমার কথায় কানও দিলনা।'

'এই নাও' বলে পথিক বৃদ্ধের বেশরক্ষনীর মধ্যে মুদ্রাদুটো ছুড়ে দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে চলে গেল।

নুডলস্ বিক্রেতা যেন ওত পেতেই ছিল, চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল ঃ 'ওহে বুড়ে কতটা খাবে ?'

এতক্ষণে বৃদ্ধ একটু নড়ে বসল এবং উৎসাহ নিয়ে মুদ্রাদুটো খুঁজতে লাগল। যখন দেখল যে রৌপ্যমুদ্রার সঙ্গে একটা তাম্যমুদ্রাও আছে সে বলে 'একটা ছোট পাত্রই যথেষ্ট।'

দোকানী একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল, 'এরকম একটা ছোট পাত্রেই তোমার পেট ভরবে ?'

বৃদ্ধের নির্বিকার জবাব 'ওটা আমার জন্য নয়।'

দোকানী ক্রমবর্ধমাণ বিস্ময় নিয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকাল কিন্তু কিছু না জিজ্ঞাসা করে এক পাত্র নুডলস্ এনে বলে 'এই নাও।' এবং সেটা কে খায় দেখার জন্য ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগল।

বৃদ্ধ তার অবশিষ্ট সবটুকু শক্তিতে ভর করে উঠে দাঁড়াল এবং কম্পমান দু'হাতের মধ্যে নুডলস্এর পাত্রটা নিয়ে কাছে রাখা বুঁচকিটার দিকে এগিয়ে গেল। বৃদ্ধ একটা বোঝার উপর থেকে লেপ কাঁথা সরাতে লাগল এবং কিছুক্ষণ পরেই একটা শিশুর বুভুক্ষা কুঞ্চিত মুখ তার মধ্যে থেকে উঁকি দিল। অনাহারে তার চোখ দুটো বন্ধ। দেখে মনে হয় শিশুটা বুঝি মরেই গেছে। কিন্তু

বৃদ্ধকে আর কোন পাত্রের কথা না বলতে দেখে দোকানী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওই রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে কি করবে?' দোকানীর এই প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ নিজ চরিত্রের উপর একপলক আলো ফেলে ঘাড় নেড়ে বলতে থাকল—'ওটা দিয়ে বীজ ধান কিনব। যখনই ওটা আমি পেলাম তখনই ঠিক করেছি যে ওটা দিয়ে কিছু বীজই কিনব। বীজ না কিনলে অমন উর্বর জমিগুলো আগামী বছর চাষ হবে কি দিয়ে? ওরা তো আমার বারণ না শুনে সব বীজ খেয়ে ফেলেছে।'

দোকানী বিমোহিত স্বরে বল্লে—'আমি যদি এতটা দরিদ্র না হতাম তাহলে হয়ত তোমাকে একপাত্র এমনিতেই দিতে পারতাম। কিছু যার কাছে রৌপ্যমুদ্রা আছে, তাকে এমনি দেওয়া········। না, না, তা হতে পারে না।'

বৃদ্ধ আপন খেয়ালে বলে যেতে থাকে—'কেন ভাই, আমি তো তোমার কাছে আর চাইছি না। জানি তুমি আমার দুঃখ বুঝবে না। যার জমি জায়গা নেই সে আমার দুঃখ অনুভব করতে পারবে না। কিছু বীজ কিনে জমিগুলো আবার আমাদের ব্যবস্থা করতেই হবে, নতুবা আগামী বছর আমাদের কপালে উপোষ ছাড়া আর কিছুই লেখা থাকবে না। এই একমাত্র নাতির জন্য আমার সবচেয়ে বড় করণীয় এটাই—হ্যাঁ আমি হয়ত আর বাঁচব না কিন্তু আমার বংশধরেরা নিশ্চয় সেই বীজ দিয়ে জমিগুলো চাষ করবে'—এই বলে বৃদ্ধ টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল এবং ঝোলা দুটো তুলে নিয়ে শূন্যদৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত করে হেঁটে চল্ল। অনুবাদ ঃ এ. এস. এম. মাসুদ

দুই ভাই

ব্যুয়োরষ্টার্নে বুয়োর্ণসন

বার্ড এবং এ্যাণ্ডার্স নামে ছুই ভাই একটি শহরে একসঙ্গে বাস করত। ছুজনেই ছুজনকে খুব ভালবাসতো, তাই একে অন্যের সম্পর্কে খুবই ভাবনা চিন্তা করত, সেনাবিভাগে একই সঙ্গে চাকরি নিয়েছিল, একসময়ে কর্পোরালের পদে প্রমোশন পেয়ে যায়। ছুজনকে আলাদা আলাদা চলাফেরা করতে কেউ কখনো দেখেনি। একই সঙ্গে তারা যুদ্ধে গিয়েছিল, যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর লোকে বলত ছুজনেই সমান বীরপুরুষ।

এমন সময় এক ছুর্ঘটনা ঘটল। হঠাৎ তাদের বাবা মারা গেলেন। ছেলেদের জন্য অবশ্য বাবা অনেক সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারা করতে অনেক অসুবিধা হবে মনে করে নীলামে সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিল। বিক্রির টাকাটা ছুজনে সমানভাবে ভাগ করে নিল।

ওদের বাবার একটা সোনার হাতঘড়ি ছিল। সেই ঘড়িটার কথা অনেকেই জানতো। এমন ঘড়ি কেউ কখনো দেখেনি, তাই অনেকের মুখে মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়েছিল দূর দূরান্তে। ঘড়িটার ওপর লোভ আছে অনেকের। তাই যখন ঘড়িটাকে নীলামে চড়ানো হল তখন অনেকেই ভাবল ঘড়িটা কেনার জন্য দর দেবে। কিন্তু ছুইভাইকে ঘড়িটা কেনার ব্যাপারে উৎসাহী দেখে সকলেই সরে দাঁড়ালো। ঘড়িটা কেনার জন্য ছুভাই নীলামে ডাকাডাকি করবে কেউ ভাবতে পারে নি। বড় ভাই বার্ড ভাবলো ছোটভাই এ্যাণ্ডার্স কোন দর না দিয়ে ছেড়ে দেবে, ছোটভাই এ্যাণ্ডার্সও ভাবলো বড়ভাই বার্ড তাকে ছেড়ে দেবে, কিন্তু সকলে অবাক হয়ে দেখল কেউ কাউকে ছেড়ে দিতে চাইছে না। ছুজনেই নীলামে ডাকাডাকি শুরু করেছে। এ্যাণ্ডার্স দর দিল কুড়ি ডলার আর সঙ্গে সঙ্গেই বার্ড দর চড়িয়ে দিয়ে বলল, তিরিশ ডলার। এইভাবেই ঘড়িটার দাম আস্তে আস্তে বেড়ে চলেছে।

অবশেষে বার্ড এক সময়ে একশ ডলার দর হেঁকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল নীলাম ঘর থেকে। কিছুক্ষণ পর একজন লোক এসে বার্ডকে খবর দিল, তুমি ঘড়িটা পেয়ে গেছ, এ্যাণ্ডার্স তোমার থেকে বেশি দর দিতে পারেনি। বার্ড দেখল নীলাম ঘর থেকে একদল লোকের সঙ্গে এ্যাণ্ডার্স বেরিয়ে আসছে, ঘড়িটা পাওয়ার পরও বার্ড বিন্দুমাত্র আনন্দ প্রকাশ করল না। উপরন্তু সে ঘড়ির কথা ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র তার ভাইয়ের কথা ভাবতে শুরু করল। তার মনটা দুঃখে ভরে গেল, এ্যাণ্ডার্স কাছে না এসে দূর থেকে গলা চড়িয়ে বলল, ধন্যবাদ নীলামে জিতে তুমি ঘড়িটা পেয়েছ, এখন ঘড়িটা তোমার। কিন্তু আমাকে আর কোনদিন পাবে না। বার্ডও চীৎকার করে উত্তর দিল, আমিও তোমার বাড়িতে কোন দিন পা দেবনা। সেইদিন থেকে দুজনে আলাদা হয়ে গেল। পৈত্রিক বাড়িতে আর একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। তাই সেই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে ভাড়া বাড়িতে গিয়ে উঠল। একই গাঁয়ের দুপ্রান্তে দুটো ঘর ভাড়া নিয়ে দুজনে বাস করতে শুরু করল।

কেউ কারোর বাড়িতে যায় না, দেখা করার কোন চেষ্টাও করে না। এইভাবে দিন কাটছে, কিছু দিনের মধ্যেই এ্যাণ্ডার্স বিয়ে করল। বিয়েতে আসার জন্য বার্ডকে নিমন্ত্রণ করেনি, বিয়ে করার এক বছরের মধ্যেই এ্যাণ্ডার্সের একটি মাত্র গরু মারা গেল। একদিন সকালে উঠে এ্যাণ্ডার্স দেখতে পেল গরুটা তার বাড়ির উত্তর দিকে মরে পড়ে আছে। এতে তার অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। কিন্তু এ্যাণ্ডার্সের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল সেদিন। গভীর রাত, সকলে ঘুমিয়ে আছে, এমন সময় তার বিরাট বড় খড়ের গাদায় আগুন লেগে গেল। আগুনের প্রকোপে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল, শুধুমাত্র তার ঘরটা কোনরকমে বেঁচে গেছে।

এই খবর পেয়ে বার্ড ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল, এই বিপদে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবার কথা ভাবলো। পরের দিন সন্ধেবেলায় বার্ড গিয়ে হাজির হল ভাইয়ের বাড়িতে।

এ্যাণ্ডার্স তখন বিছানায় শুয়ে ছিল, বার্ডের গলায় শব্দ শুনে অবাক হয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল বিছানায়। গম্ভীর গলায় বলল, কেন এসেছ এখানে ? কি চাও তুমি ? তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল এ্যাণ্ডার্স।

বার্ড ধারালো প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এতটুকু বিব্রত বোধ করেনি। অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বলল, আমি তোমার সব দুর্যোগের খবর পেয়েছি, তাই চুপ করে বসে থাকতে পারিনি, ছুটে এসেছি তোমাকে সাহায্য করতে এ্যাণ্ডার্স। তোমার দিন ভালো যাচ্ছে না, এখন আমার সাহায্য তোমার প্রয়োজন।

তুমি যা চেয়েছিলে তাই তো ঘটছে। তুমি চলে যেতে পারো। আমাকে সাহায্য করার জন্য তোমার কোন প্রয়োজন নেই, আমি নিজেই সামলে নিতে পারব।

তুমি আমাকে ভুল বুঝোনা এ্যাণ্ডার্স, আমার কাজের জন্য আমি অনুতপ্ত।

এখনই চলে যাও বার্ড। একমাত্র ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করতে পারবেন।

বার্ড আর কিছু না বলে চলে যাবার জন্য পা বাড়ালো, হঠাৎ কি ভেবে ঘুরে দাঁড়িয়ে কাঁপা গলায় বলল, যদি তুমি চাও তো আমার কাছ থেকে ঘড়িটা নিতে পার।

এ্যাণ্ডার্স তার ভাবনা থেকে একটুও টললো না। তাই চিৎকার করে বলল, তুমি চলে গেলে আমি খুশি হব।

এই ঘটনার আগে-একদিন চার্চে এ্যাণ্ডার্সকে দেখতে পেয়েছিল বার্ড। তার পরনের পোষাকটি অত্যন্ত পুরনো, ছেঁড়া আর তালি দেওয়া। ভাইয়ের অবস্থা দেখে বার্ডের খুব দুঃখ হয়েছিল, কিন্তু তখন বার্ড কোন কথা বলতে পারেনি, কারণ সঙ্গে ছিল এ্যাণ্ডার্সের স্ত্রী।

সেইদিন সন্ধ্যার পর বার্ড ছুটে গিয়েছিল 'এ্যাণ্ডার্সের বাড়িতে, কিন্তু ভেতরে ঢুকতে সাহস পায়নি। চুপি চুপি এ্যাণ্ডার্সের ঘরের কাছে দাঁড়িয়েছিল অনেকক্ষণ। সেইসময় বার্ড শুনতে পেয়েছিল

এ্যাণ্ডাসের্ণর স্ত্রী তাকে বলছে, আজ তোমার দাদা তোমাকে খুজতে চার্চে গিয়েছিল, সে হয়তো সবসময়েই তোমার কথা ভাবে।

এ কথা বিশ্বাস করতে পারেনা এ্যাণ্ডার্স। তাই সে তার বিশ্বাসে অবিচল থেকে বলল, না, সে কেন আমার কথা ভাববে ? আমি জানি সে আমার কথা একেবারেই ভাবে না। সে ভাবে শুধু নিজের কথা।

তারপর সব চুপচাপ হয়ে যায়। বার্ড তবুও দাঁড়িয়েছিল, যদি আর কোন কথা শুনতে পায় সেই আশায়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঠাণ্ডা আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল. এ্যাণ্ডার্সের স্ত্রী উনোনে কেটলি জল গরম করছিল. একটা বাচ্চা ছেলে থেকে থেকে কেঁদে উঠছিল। এ্যাণ্ডার্স কান্না শুনে খুবই বিরক্ত বোধ করছিল, তাই তাকে থামানোর জন্য মারছিল। কিছু পরে তার স্ত্রী আবার বলল, আমার মনে হয় তোমরা দুজনের কথা ভাবছ।

একই কথা বারবার শুনতে রাজী নয় এ্যাণ্ডার্স। অত্যন্ত বিরক্তির সুরে বলল, ওর প্রসঙ্গ নিয়ে আর কিছু না বলে অন্য কথা বলো।

ওর স্ত্রী এরপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, হা ভগবান!

বার্ড আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে ফিরে এসেছিল। ওর খুব ইচ্ছে করছিল ঘরে ঢুকে ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে। কিন্তু কিছুতেই সফল হতে পারে নি। সেইদিনই এ্যাণ্ডার্সের খড়ের গাদায় আগুন লেগেছিল। তার আয়ের একমাত্র উৎস, একমাত্র সম্বল সবই পুড়ে যায় আগুনে। পরদিন সন্ধ্যায় বার্ড আবার ছুটে যায় ভাইয়ের বাড়িতে।

খড়ের গাদায় আগুন লাগলে এ্যাণ্ডার্সের মনে পড়ে গিয়েছিল বার্ডের কথা। এ ব্যাপারে ওই যুক্ত আছে বলে সন্দেহ করে এ্যাণ্ডার্স। কিন্তু প্রকাশ্যে সে কথা বলতে পারে নি।

যে রবিবার রাতে এ্যাণ্ডার্সের খড়ের গাদায় আগুন লাগে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বার্ডকে তার পাশ দিয়ে যেতে দেখেছিল কয়েকটি ছেলে-মেয়ে। পাড়ার অনেক লোক পরেরদিন সকালে সেখানে বার্ডকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে। এইজন্যই অনেকে সন্দেহ

করে যে অগ্নিকাণ্ডের দুর্ঘটনার সঙ্গে বার্ড প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বিশেষ করে সকলেই যখন জানত, দুভাইয়ের মধ্যে সদ্ভাব নেই, হিংসা আর শত্রুতা চলছে এখন। মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ। সুতরাং বার্ডের পক্ষে এই ধরণের জঘন্য কাজে লিপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়। শত্রুতা থাকলে অনেক কিছু করতে পারে মানুষ।

স্থানীয় লোকেরা একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নিল কর্তৃপক্ষের কাছে বার্ডের বিরুদ্ধে নালিশ করার। তাই শুরু হল তদন্ত। পুলিশ বার্ডকে এ্যাণ্ডার্সের বাড়িতে ডেকে পাঠায়, সেখানে তাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে। তেমন কিছু জানতে না পেরে অবশেষে পুলিশ সরাসরি এ্যাণ্ডার্সকে জিজ্ঞাসা করল, এ ব্যাপারে তার দাদার সম্পর্কে কোন সন্দেহ পোষণ করে কিনা।

বার্ড তখন করুণ দৃষ্টিতে তাকায় এ্যাণ্ডার্সের মুখের দিকে। তা দেখে এ্যাণ্ডার্সের মনের ভিতর কেমন যেন একটা পরিবর্তন ঘটে গেল, তাই প্রকাশ্যে সকলের সামনে বলল না, আমার দাদার উপরে আমার কোন সন্দেহ নেই।

এতবড় লোকসানের ভার সহজে মেনে নিতে পারেনি এ্যাণ্ডার্স। মনের যন্ত্রণা ভুলতে সে খুব বেশি করে মদ খেতে শুরু করল। দিনে দিনে তার শরীর খারাপ হতে লাগল। বার্ড মদ পান করে না, কিন্তু তার মনের অবস্থা এ্যাণ্ডার্সের শরীরের অবস্থা থেকেও আরো অনেক বেশি খারাপ হয়ে উঠল। সেটা কারো নজরে পড়েনি, কেউ সেকথা বুঝতে পারল না, জানতেও পর্যন্ত পারল না।

একদিন সন্ধোবেলায় বার্ড নিজের ঘরে বসে কি যেন ভাবছে, এমন সময় একজন দুঃস্থ ভদ্র মহিলা ঘরের মধ্যে ঢুকে তাকে অনুরোধ করল তার সঙ্গে এক জায়গায় যাবার জন্য।

তাকে দেখেই বার্ড সহজে চিনতে পেরেছে, সে তার ছোট ভাইয়ের স্ত্রী।

অজানা আশঙ্কায়, ভয়ে মুখখানা ম্লান ফ্যাকাশে হয়ে উঠল বার্ডের। তার মনে হল, নিশ্চয়ই কোন অঘটন ঘটেছে, তা না হলে ভাইয়ের

স্ত্রী কখনও ছুটে আসত না তার কাছে। এখনও পর্যন্ত ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় কিছুই হয়নি।

তার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারে নি বার্ড। সঙ্গে সঙ্গেই পোশাক পরে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

বাইরে তখন বরফ পড়ছে, বরফে ঢেকে গেছে সব পথঘাট। রাত্রির অন্ধকারে বরফগুলো চকচক করছিল। কিছুদূর গিয়ে বার্ড দেখতে পেল এ্যাণ্ডার্সের ঘরের জানালার সামান্য ফাঁক দিয়ে আলোর ছটা বাইরে এসে পড়ছে। এতখানি পথ পেরিয়ে এল অথচ ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে একটাও কথা বলতে পারেনি।

ঘরের ভেতর ঢুকতেই একটা দুর্গন্ধ বার্ডের নাকে এল। তার চোখে পড়ল একটা শিশু উনোনের কাছে বসে কাঠকয়লা মুখে পুরে চিবোচ্ছে। তার মুখটা কালো হয়ে উঠেছে। বিছানার উপর কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে এ্যাণ্ডার্স। সংসারের কোন ব্যাপারে সে আর ভাবতে চায় না। তার বলিষ্ঠ দেহটা একেবারে শীর্ণ হয়ে বিছানার সঙ্গে যেন মিশে গেছে। গালে মাংস নেই। কপালটা অত্যধিক উঁচু মনে হচ্ছে আর মুখের চোয়াল দুটো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শিশুটি কয়লা খেতে খেতে কালো মুখের ভেতর থেকে সাদা ঝকমকে দাঁত বের করে হাসছিল।

বার্ড সহজেই বুঝল এটি তার ভাইয়ের ছেলে।

ঘরের মধ্যে এক দৈন্যদশা অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। এসব সহ্য করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। বার্ডের পাদুটো ভয়ানক কাঁপতে শুরু করেছে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। যে কোন মুহূর্তেই মাটিতে পড়ে যেতে পারে। বিছানার একধারে বসে সে আকুলভাবে কেঁদে উঠল। নিজেকে সামলে রাখার সব ক্ষমতাই হারিয়ে ফেলেছে সে। এ্যাণ্ডার্স বার্ডকে কিছু বলতে চায়। তাই ইশারায় স্ত্রীকে বলল ঘরের বাইরে চলে যেতে। কিন্তু বার্ড তাকে যেতে দিল না। ওর সামনে দুজনের কথা বলতে কোন অসুবিধা নেই।

দুইভাই অনেকদিন পর প্রাণখুলে কথা বলতে লাগল। তারা

ছুজনেই একমত, যেদিন থেকে তাদের পৈতৃক বাড়িটা নীলামে চড়িয়েছে সেদিন থেকেই তাদের মনের সব শান্তি হারিয়ে গেছে। নিদারুণ এক অশান্তি ছুজনকেই কুরে কুরে খেয়েছে। তার ওপর ঘটেছে একের পর ছুর্ঘটনা, এর ফলে এ্যাণ্ডার্স একেবারেই নিঃস্ব হয়ে গেছে।

রোগে ভুগে ভুগে এ্যাণ্ডার্স খুব ক্ষীণ আর ছুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই সে বেশি কথা বলতে পারল না। কিন্তু বার্ড সেই বিছানা থেকে সারা রাতের মধ্যে একবারের জন্যও উঠতে চায়নি। সমস্ত সময় সে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে বার্ডের। তারা ছুজনে একসঙ্গে খেলা করে বেড়াত, একসঙ্গে পড়াশুনা করত, তখন জীবনে ছিল কত সুখ কত শান্তি।

সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে এ্যাণ্ডার্স। সে যেন এক নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। সে সবাইকে শুনিয়ে বলল, আমি ভাল হয়ে গেছি। আর আমার কোন অসুখ নেই। বার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, এবার থেকে আগের মতই আমরা ছুজনে একসঙ্গে থাকব। আর কোন অবস্থাতেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না।

কিন্তু সেইদিনই মারা গেল এ্যাণ্ডার্স। ছোট ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী আর অনাথ শিশুটিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল বার্ড। ওদের দেখা-শোনা করার দায়িত্ব নেবার মতো আর কেউ নেই। ওদের প্রতি মমতা দেখাতে এতটুকু কার্পণ্য করেনি সে। অনেক যত্ন নিয়ে সে ওদের দেখাশোনা করছে। একথা গাঁয়ের সকলেই শুনতে পেল। বার্ডের উদারতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল গ্রামবাসীরা। সকলের মুখে মুখে এখন শুধু বার্ডের প্রশংসা। নিজের ইচ্ছাতেই ভাইয়ের সংসারের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে, কারো উপদেশ বা অনুরোধ শুনে নয়। বার্ডকে সকলেই শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

বার্ড স্কুলমাষ্টারির চাকরি নিল। সে আর বিয়ে করেনি। ভাইয়ের সংসারকেই নিজের সংসার বলে মনে করে। স্কুলে যতক্ষণ থাকে স্কুলের সব ছেলেদের নিজের ছেলের মতো মনে করে কাছে টেনে

নেয়, ভালবাসে। পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে খেলা করে তাদের সঙ্গে। স্কুলের ছেলেরাও সকলেই অসম্ভব ভালবাসে বার্ডকে। সে সবার কাছে হয়ে উঠেছে একাধারে শিক্ষক, সাথী এবং পিতা। শুধুমাত্র আন্তরিকতার সাহায্যেই বার্ড সকলের মন জয় করতে পেরেছে।

অতিথি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলালবাবু নৌকা করিয়া সপরিবারে স্বদেশে যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে মধ্যাহ্নে নদীতীরের এক গঞ্জের নিকট নৌকা বাঁধিয়া পাকের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণবালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু তোমরা যাচ্ছ কোথায়।" প্রশ্নকর্তার বয়স পনের-ষোলোর অধিক হইবে না।

মতিবাবু উত্তর করিলেন, "কাঁঠালে"।

ব্রাহ্মণবালক কহিল, "আমাকে পথের মধ্যে নদীগাঁয়ে নাবিয়ে দিতে পার ?"

বাবু সম্মতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি।"

ব্রাহ্মণবালক কহিল, "আমার নাম তারাপদ।"

গৌরবর্ণ ছেলেটিকে বড়ো সুন্দর দেখিতে। বড়ো বড়ো চক্ষু এবং হাস্যময় ওষ্ঠাধরে একটি সুললিত সৌকুমার্য প্রকাশ পাইতেছে। পরিধানে একখানি মলিন ধুতি। অনাবৃত দেহখানি সর্বপ্রকার বাহুল্য-বর্জিত ; কোনো শিল্পী যেন বহু যত্নে নিখুঁত নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছেন। যেন সে পূর্বজন্মে তাপস-বালক ছিল এবং নির্মল তপস্যার প্রভাবে তাহার শরীর হইতে শরীরাংশ বহুল পরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটি সম্মার্জিত ব্রাহ্মণ্যশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

মতিলালবাবু তাহাকে পরম স্নেহভরে কহিলেন, "বাবা তুমি স্নান করে এসো, এখানেই আহারাদি হবে।"

তারাপদ বলিল "বসুন।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ অসংকোচে রন্ধনের আয়োজনে যোগদান করিল। মতিলালবাবুর চাকরটা ছিল

হিন্দুস্থানী, মাছ-কোটা প্রভৃতি কার্যে তাহার তেমন পটুতা ছিল না ; তারাপদ তাহার কাজ নিজে লইয়া অল্পকালের মধ্যেই সুসম্পন্ন করিল এবং দুই-একটা তরকারিও অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সহিত রন্ধন করিয়া দিল। পাককার্য শেষ হইলে তারাপদ নদীতে স্নান করিয়া বোঁচকা খুলিয়া একটি শুভ্র বস্ত্র পরিল ; একটি ছোট কাঠের কাঁকই লইয়া মাথার বড় বড় চুল কপাল হইতে তুলিয়া গ্রীবার উপর ফেলিল এবং মার্জিত পইতার গোছা বক্ষে বিলম্বিত করিয়া নৌকায় মতিলালবাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

মতিবাবু তাহাকে নৌকার ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে মতিবাবুর স্ত্রী এবং তাঁহার নবমবর্ষীয়া এক কন্যা বসিয়াছিলেন। মতিবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া স্নেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন—মনে মনে কহিলেন, "আহা, কাহার বাছা, কোথা হইতে আসিয়াছে—ইহার মা ইহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া আছে।"

যথাসময়ে মতিবাবু এবং এই ছেলেটির জন্য পাশাপাশি দুইখানি আসন পড়িল। ছেলেটি তেমন ভোজনপটু নহে ; অন্নপূর্ণা তাহার স্বল্প আহার দেখিয়া মনে করিলেন, সে লজ্জা করিতেছে ; তাহাকে এটা ওটা খাইতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু যখন সে আহার হইতে নিরস্ত হইল, তখন সে কোন অনুরোধ মানিল না। দেখা গেল, ছেলেটি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে অথচ এমন সহজে করে যে, তাহাতে কোন প্রকার জেদ বা গোঁ প্রকাশ পায় না। তাহার ব্যবহারে লজ্জারও লেশমাত্র দেখা গেল না।

সকলের আহারাদির পর অন্নপূর্ণা তাহাকে কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার ইতিহাস জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্তারিত বিবরণ কিছুই সংগ্রহ হইল না। মোটকথা এইটুকু জানা গেল, ছেলেটি সাত-আট বৎসর বয়সেই স্বেচ্ছাক্রমে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে।

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, "তোমার মা নাই ?"

তারাপদ কহিল, "আছেন।"

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি তোমাকে ভালবাসেন না ?"

তারাপদ এই প্রশ্ন অত্যন্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কেন ভালবাসবেন না।"

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, "তবে তুমি তাঁকে ছেড়ে এলে যে ?"

তারাপদ কহিল, "তাঁর আরও চারটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে আছে।"

অন্নপূর্ণা বালকের এই অদ্ভুত উত্তরে ব্যথিত হইয়া কহিলেন, "ওমা, সে কি কথা। পাঁচটি আঙুল আছে বলে কি একটি আঙুল ত্যাগ করা যায়।"

তারাপদর বয়স অল্প, তাহার ইতিহাসও সেই পরিমাণে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ছেলেটি সম্পূর্ণ নতুনতরো। সে তাহার পিতামাতার চতুর্থপুত্র, শৈশবেই পিতৃহীন হয়। বহু সন্তানের ঘরেও তারাপদ সকলের অত্যন্ত আদরের ছিল ; মা ভাই বোন এবং পাড়ার সকলেরই নিকট হইতে সে অজস্র স্নেহ লাভ করিত। এমন-কি গুরু মহাশয়ও তাহাকে মারিত না—মারিলেও বালকের আত্মীয় পর সকলেই তাহাতে বেদনা বোধ করিত। এমন অবস্থায় তাহার গৃহত্যাগ করিবার কোনই কারণ ছিল না। যে উপেক্ষিত রোগা ছেলেটা সর্বদাই চুরি-করা গাছের ফল এবং গৃহস্থ লোকদের নিকট তাহার চতুর্গুণ প্রতিফল খাইয়া বেড়ায় সেও তাহার পরিচিত গ্রামসীমার মধ্যে তাহার নির্যাতনকারিণী মার নিকট পড়িয়া রহিল, আর সমস্ত গ্রামের এই আদরের ছেলে একটা বিদেশী যাত্রার দলের সহিত মিলিয়া অকাতর চিত্তে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

সকলে খোঁজ করিয়া তাহাকে গ্রামে ফিরাইয়া আনিল। তাহার মা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুজলে আর্দ্র করিয়া দিল, তাহার বোনেরা কাঁদিতে লাগিল ; তাহার বড় ভাই পুরুষ-অভিভাবকের কঠিন কর্তব্য পালন উপলক্ষে তাহাকে মৃদু রকম শাসন করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে অনুতপ্তচিত্তে বিস্তর প্রশ্রয় এবং পুরস্কার দিল। পাড়ার মেয়েরা তাহাকে ঘরে ঘরে ডাকিয়া প্রচুরতর আদর এবং বহুতর

প্রলোভনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বন্ধন, এমন কি স্নেহ-বন্ধনও তাহার সহিল না ; তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে। সে যখনই দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গুন টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অশ্বত্থগাছের তলে কোন্ দূরদেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে,, অথবা বেদেরা নদীর তীরের পতিত মাঠে ছোট ছোট চাটাই বাঁধিয়া বাঁখারি ছুলিয়া চাঙারি নির্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। উপরি-উপরি দুই-তিনবার পলায়নের পর তাহার আত্মীয়বর্গ এবং গ্রামের লোক তাহার আশা পরিত্যাগ করিল।

প্রথমে সে একটা যাত্রার দলের সঙ্গ লইয়াছিল। অধিকারী যখন তাহাকে পুত্রনির্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিল এবং দলস্থ ছোট-বড় সকলেরই যখন সে প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল, এমন কি যে বাড়িতে যাত্রা হইত সে বাড়ির অধ্যক্ষগণ, বিশেষত পুরমহিলাবর্গ যখন বিশেষরূপে তাহাকে আহ্বান করিয়া সমাদর করিতে লাগিল তখন একদিন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারাপদ হরিণশিশুর মতো বন্ধনভীরু, আবার হরিণেরই মতো সংগীতমুগ্ধ। যাত্রার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগি করিয়া দেয়। গানের সুরে তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন এবং গানের তালে তাহার সর্বাঙ্গে আন্দোলন উপস্থিত হইত। যখন সে নিতান্ত শিশু ছিল তখনও সংগীতসভায় সে যেরূপ সংযত গম্ভীর বয়স্ক-ভাবে আত্মবিস্মিত হইয়া বসিয়া দুলিত, দেখিয়া প্রবীন লোকের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইত। কেবল সঙ্গীত কেন, গাছের ঘন পল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্য শিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বহুদূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব,

গভীর রাত্রে শৃগালের চীৎকারধ্বনি সকলই তাহাকে উতলা করিত। এই সংগীতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া সে অনতিবিলম্বে এক পাঁচালীর দলের মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। দলাধ্যক্ষ তাহাকে পরম যত্নে গান শিখাইতে এবং পাঁচালি মুখস্থ করাইতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহাকে আপন বক্ষপিঞ্জরের পাখির মতো প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্নেহ করিতে লাগিল। পাখি কিছু কিছু গান শিখিল এবং একদিন প্রত্যুষে উড়িয়া চলিয়া গেল।

শেষবারে সে এক জিমন্যাষ্টিকের দলে জুটিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠমাসের শেগভাগ হইতে আষাঢ়মাসের অবসান পর্যন্ত এ অঞ্চলে স্থানে স্থানে পর্যায়ক্রমে বারোয়ারির মেলা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে দুই তিন দল যাত্রা, পাঁচালি. কবি, নর্তকী এবং নানাবিধ দোকান নৌকাযোগে ছোট ছোট নদী উপনদী দিয়া এক মেলা-অন্তে অন্য মেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। গত বৎসর হইতে কলিকাতার এক ক্ষুদ্র জিম্‌ন্যাষ্টিকের দল এই পর্যটনশীল মেলার আমাদচক্রের মধ্যে যোগ দিয়াছিল। তারাপদ প্রথমত নৌকারোহী দোকানীর সহিত মিলিয়া মিশিয়া মেলায় পানের খিলি বিক্রির ভার লইয়াছিল। পরে তাহার স্বাভাবিক কৌতূহল-বশত এই জিম্‌ন্যাষ্টিকের আশ্চর্য ব্যায়ামনৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া এই দলে প্রবেশ করিয়াছিল। তারাপদ নিজে নিজে অভ্যাস করিয়া ভাল বাঁশি বাজাইতে শিখিয়াছিল জিম্‌ন্যাষ্টিকের সময় তাহার দ্রুততালে লক্ষ্ণৌ ঠুংরির সুরে বাঁশি বাজাইতে হইত—এই তাহার এক মাত্র কাজ ছিল।

এই দল হইতেই তাহার শেষ পলায়ন। সে শুনিয়াছিল, নন্দী-গ্রামের জমিদারবাবুরা মহাসমারোহে এক শখের যাত্রা খুলিতেছেন—শুনিয়া সে তাহার ক্ষুদ্র বোঁচকাটি লইয়া নন্দীগ্রামে যাত্রার আয়োজন করিতেছিল, এমন সময় মতিবাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।

তারাপদ পর্যায়ক্রমে নানা দলের মধ্যে ভিড়িয়াও আপন স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতি-প্রভাবে কোন দলের বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। অন্তরের মধ্যে সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং মুক্ত ছিল। সংসারে অনেক

কুৎসিত কথা সে সর্বদা শুনিয়াছে এবং অনেক কদর্য দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু তাহা তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইবার তিলমাত্র অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। এ ছেলেটির কিছুতেই খেয়াল ছিল না। অন্যান্য বন্ধনের ন্যায় কোন প্রকার অভ্যাস বন্ধনও তাহার মনকে বাধ্য করিতে পারে নাই। সে এই সংসারে পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মতো সাঁতার দিয়া বেড়াইত। কৌতূহল বশতঃ যতবারই ডুব দিত তাহার পাখা সিক্ত বা মলিন হইতে পারিত না। এই জন্য এই গৃহত্যাগী ছেলেটির মুখে একটি শুভ্র স্বাভাবিক তারুণ্য অম্লানভাবে প্রকাশ পাইত, তাহার সেই মুখশ্রী দেখিয়া প্রবীণ বিষয়ী মতিলালবাবু তাহাকে . বিনা প্রশ্নে, বিনা সন্দেহে, নরম আদরের আহ্বান করিয়া লইছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আহারান্তে নৌকা ছাড়িয়া দিল। অন্নপূর্ণা পরম স্নেহে এই ব্রাহ্মনবালককে তাহার ঘরের কথা তাহার আত্মীয়পরিজনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; তারাপদ অত্যন্ত সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া বাহিরে আসিয়া পরিত্রান লাভ করিল। বাহিরে বর্ষার নদী পরিপূর্ণতার শেষ রেখা পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়া আপন আত্মহারা উদ্দাম চাঞ্চল্যে প্রকৃতিমাতাকে যেন উদ্‌বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। মেঘনির্মুক্ত রৌদ্রে নদীতীরের অর্ধনিমগ্ন কাশতৃনশ্রেণী এবং তাহার উর্ধ্বে সরস সঘন ইক্ষুক্ষেত্র এবং তাহার পরপ্রান্তে দূরদিগন্তচুম্বিত নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখা সমস্তই যেন কোন এক রূপকথার সোনার কাঠির স্পর্শে সদ্যো-জাগ্রত নবীন সৌন্দর্যের মতো নির্বাক নীলাকাশের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্ত যেন সজীব, স্পন্দিত, প্রগল্‌ভ আলোকে উদ্ভাসিত, নবীনতায় সুচিক্কন, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ।

তারাপদ নৌকার ছাদের উপরে পালের ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লইল। পর্যায়ক্রমে ঢালু সবুজ প্লাবিত পাটের খেত, গাঢ় শ্যামল আমন ধান্যের আন্দোলন, ঘাট হইতে গ্রামাভিমুখী সংকীর্ণ পথ, ঘনবনবেষ্টিত ছায়াময় গ্রাম তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই জল স্থল আকাশ, এই চারিদিকে সচলতা সজীবতা মুখরতা, এই উর্ধ্ব-অধোদে-শের ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য এবং নির্লিপ্ত সুদূরতা, এই সুবৃহৎ চিরস্থায়ী নির্নিমেষ বাক্যবিহীন বিশ্বজগৎ তরুন বালকের পরমাত্মীয় ছিল, অথচ সে এই চঞ্চল মানবটিকে এক মুহূর্তের জন্য ও স্নেহবাহু দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত না। নদী তীরে বাছুর লেজ তুলিয়া ছুটিতেছে, গ্রাম্য টাটুঘোড়া সম্মুখের দুই দড়িবাঁধা পা লইয়া লাফ দিয়া দিয়া ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছে, মাছরাঙা জেলেদের জাল বাঁধিবার বংশদণ্ডের উপর হইতে ঝপ করিয়া সবেগে জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া মাছ ধরিতেছে,

ছেলেরা জলের মধ্যে পড়িয়া মাতামাতি করিতেছে মেয়েরা উচ্চকণ্ঠে সহাস্য গল্প করিতে করিতে আবক্ষ জলে বসনাঞ্চল প্রসারিত করিয়া দুই হস্তে তাহা মার্জন করিয়া লইতেছে, কোমর-বাঁধা মেছুনিরা চুপড়ি লইয়া জেলেদের নিকট হইতে মাছ কিনিতেছে, এ সমস্তই সে চিরনূতন অশ্রান্ত কৌতূহলের সহিত বসিয়া বসিয়া দেখে, কিছুতেই তাহার দৃষ্টির পিপাসা নিবৃত্ত হয় না।

নৌকার ছাতের উপরে গিয়া তারাপদ ক্রমশ দাঁড়ি মাঝিদের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। মাঝে মাঝে আবশ্যক মতো মাল্লাদের হাত হইতে লগি লইয়া নিজেই ঠেলিতে প্রবৃত্ত হইল; মাঝির যখন তামাক খাইবার আবশ্যক, তখন সে নিজে গিয়া হাল ধরিল—যখন যে দিকে পাল ফিরানো আবশ্যক সমস্ত সে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দিল।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে অন্নপূর্ণা তারাপদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল "রাত্রে তুমি কি খাও।"

তারাপদ কহিল "যা পাই তাই খাই; সকল দিন খাইও না।"

এই সুন্দর ব্রাহ্মণবালকটির আতিথ্য গ্রহণে ঔদাসীন্য অন্নপূর্ণাকে ঈষৎ পীড়া দিতে লাগিল। তাহার বড়ো ইচ্ছা, খাওয়াইয়া পরাইয়া এই গৃহচ্যুত পান্থ বালকটিকে পরিতৃপ্ত করিয়া দেন। কিন্তু কিসে যে তাহার পরিতোষ হইবে তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না। অন্নপূর্ণা চাকরদের ডাকিয়া গ্রাম হইতে দুধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য ধুমধাম বাধাইয়া দিলেন। তারাপদ যথাপরিমানে আহার করিল, কিন্তু দুধ খাইল না। মৌনস্বভাব মতিলালবাবুও তাহাকে দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, সে সংক্ষেপে বলিল "আমার ভাল লাগে না।"

নদীর উপর দুই-তিনদিন গেল, তারাপদ রাঁধাবাড়া, বাজার-করা হইতে নৌকা-চালনা পর্যন্ত সকল কাজেই স্বেচ্ছা ও তৎপরতার সহিত যোগ দিল। যে-কোন দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে আসে তাহার প্রতি তারাপদর সকৌতূহল দৃষ্টি ধাবিত হয়, যে-কোন কাজ তাহার হাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাতেই সে আপনি আকৃষ্ট

হইয়া পড়ে। তাহার দৃষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্বদাই সচল হইয়া আছে, এইজন্য সে এই নিত্য সচলা প্রকৃতির মতো সর্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন, অথচ সর্বদাই ক্রিয়াসক্ত, মানুষ মাত্রেই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান ভূমি আছে; কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্বল তরঙ্গ—ভূত ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই—সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য।

এ দিকে অনেকদিন নানা সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়া অনেকপ্রকার মনোরঞ্জনী বিদ্যা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। কোনপ্রকার চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন না থাকাতে তাহার নির্মল স্মৃতিপটে সকল জিনিস আশ্চর্য সহজে মুদ্রিত হইয়া যাইত। পাঁচালি কথকথা কীর্তনগান যাত্রাভিনয়ের সুদীর্ঘ খণ্ড সকল তাহার কণ্ঠাগ্রে ছিল। মতিলালবাবু চির প্রথামত একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার স্ত্রী-কন্যাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিলেন; কুশলবের কথার সূচনা হইতেছে এমন সময়ে তারাপদ উৎসাহ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নৌকার ছাতের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, "বই রাখুন। আমি কুশলবের গান করি, আপনারা শুনে যান।"

এই বলিয়া সে কুশলবের পাঁচালি আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশির মতো সুমিষ্ট পরিপূর্ণসুরে দাশুরায়ের অনুপ্রাস ক্ষিপ্রবেগে বর্ষন করিয়া চলিল। দাঁড়ি মাঝি সকলে দ্বারের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল হাস্য করুণা এবং সংগীতে সেই নদীতীরের সন্ধ্যাকাশে এক অপূর্ব রসস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল—দুই নিস্তব্ধ তটভূমি কুতূহলী হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া যে সকল নৌকা চলিতেছিল তাহাদের আরোহীগণ ক্ষনকালের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সেইদিকে কান দিয়া রহিল। যখন শেষ হইয়া গেল সকলেই ব্যথিত চিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল ইহারই মধ্যে শেষ হইল কেন।

সজলনয়না অন্নপূর্ণার ইচ্ছা করিতে লাগিল ছেলেটিকে কোলে বসাইয়া বক্ষে চাপিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করেন। মতিলালবাবু ভাবিতে লাগিলেন, "এই ছেলেটিকে যদি কোনমতে কাছে রাখিতে পারি তবে পুত্রের অভাব পূর্ণ হয়।" কেবল ক্ষুদ্র বালিকা চারুশশীর অন্তঃকরণ ঈর্ষা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চারুশশী তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাঁহাদের পিতৃমাতৃস্নেহের একমাত্র অধিকারিণী। তাহার খেয়াল ও জেদের অন্ত ছিল না। খাওয়া, কাপড় পরা, চুল বাঁধা সম্বন্ধে তাহার নিজের স্বাধীন মত ছিল, কিন্তু সে মতের কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। যেদিন কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিত সেদিন তাহার মায়ের ভয় হইত পাছে মেয়েটি সাজসজ্জা সম্বন্ধে একটা অসম্ভব জেদ ধরিয়া বসে। যদি দৈবাৎ একবার চুলবাঁধাটা তাহার মনের মত না হইল, তবে সেদিন যতবার চুল খুলিয়া যতরকম করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাক কিছুতেই তাহার মন পাওয়া যাইবে না, অবশেষে মহাকান্নাকাটির পালা পড়িয়া যাইবে। সকল বিষয়েই এইরূপ। আবার এক এক সময় চিত্ত যখন প্রসন্ন থাকে তখন কিছুতেই তাহার কোন আপত্তি থাকে না। তখন সে অতিমাত্রায় ভালোবাসা প্রকাশ করিয়া তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া হাসিয়া বকিয়া একেবারে অস্থির করিয়া তোলে। এই ক্ষুদ্র মেয়েটি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।

এই বালিকা তাহার দুর্বোধ্য হৃদয়ের সমস্ত বেগ প্রয়োগ করিয়া মনে মনে তারাপদকে সুতীব্র বিদ্বেষে তাড়না করিতে লাগিল। পিতামাতাকেও সর্বতোভাবে উদ্‌বেজিত করিয়া তুলিল। আহারের সময় রোদনমুখী হইয়া ভোজনের পাত্র ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, রন্ধন তাহার রুচিকর বোধ হয় না, দাসীকে মারে, সকল বিষয়েই অকারণ অভিযোগ করিতে থাকে। তারাপদর বিদ্যাগুলি যতই তাহার এবং অন্যসকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল, ততই যেন তাহার রাগ বাড়িয়া উঠিল। তারাপদর যে কোন গুণ আছে ইহা স্বীকার করিতে তাহার মন বিমুখ হইল অথচ তাহার প্রমাণ যখন প্রবল হইতে লাগিল, তাহার অসন্তোষের মাত্রাও উচ্চে উঠিল। তারাপদ যেদিন কুশলবের গান করিল সেদিন অন্নপূর্ণা মনে করিলেন, "সংগীতে বনের পশু বশ হয়, আজ বোধ হয় আমার মেয়ের মন গলিয়াছে।" তাহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন, “চারু কেমন লাগল।” সে কোন উত্তর না দিয়া অত্যন্ত প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া দিল। এই ভঙ্গিটিকে ভাষায় তর্জমা করিলে এইরূপ দাঁড়ায় কিছুমাত্র ভাল লাগে নাই এবং কোনকালে ভালো লাগিবে না।

চারুর মনে ঈর্ষার উদয় হইয়াছে বুঝিয়া তাহার মাতা চারুর সম্মুখে তারাপদর প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন। সন্ধ্যার পরে যখন সকাল সকাল খাইয়া চারু শয়ন করিত তখন অন্নপূর্ণা নৌকাকক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া বসিতেন এবং মতিবাবু ও তারাপদ বাহিরে বসিত এবং অন্নপূর্ণার অনুরোধে তারাপদ গান আরম্ভ করিত, তাহার গানে যখন নদীতীরের বিশ্রামনিরতা গ্রামশ্রী সন্ধ্যার বিপুল অন্ধকারে মুগ্ধ নিস্তব্ধ হইয়া রহিত এবং অন্নপূর্ণার কোমল হৃদয়খানি স্নেহে ও সৌন্দর্যরসে উচ্ছলিত হইতে থাকিত তখন হঠাৎ চারু দ্রুতপদে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া সরোষ-সরোদনে বলিত, “মা তোমরা কী গোল করছ আমার ঘুম হচ্ছে না।” পিতামাতা তাহাকে একলা ঘুমাইতে পাঠাইয়া তারাপদকে ঘিরিয়া সংগীত উপভোগ করিতেছেন ইহা তাহার একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিত।

এই দীপ্তকৃষ্ণনয়না বালিকার স্বাভাবিক সুতীব্রতা তারাপদর নিকটে অত্যন্ত কৌতুকজনক বোধ হইত। সে ইহাকে গল্প শুনাইয়া গান গাহিয়া বাঁশি বাজাইয়া, বশ করিতে অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইল না। কেবল তারাপদ মধ্যাহ্নে যখন নদীতে স্নান করিতে নামিত, পরিপূর্ণ জলরাশির মধ্যে গৌরবর্ণ সরল তনুদেহখানি নানা সন্তরণভঙ্গিতে অবলীলাক্রমে সঞ্চালন করিয়া তরুণ জলদেবতার মতো শোভা পাইত, তখন বালিকার কৌতূহল আকৃষ্ট না হইয়া থাকিত না, সে সেইসময়টির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত, কিন্তু আন্তরিক আগ্রহ কাহাকেও জানিতে দিত না, এবং এই অশিক্ষাপটু অভিনেত্রী পশমের গলাবন্ধ বোনা একমনে অভ্যাস করিতে করিতে মাঝে মাঝে অত্যন্ত উপেক্ষাভরে কটাক্ষে তারাপদর সন্তরণলীলা দেখিয়া লইত।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

নন্দীগ্রাম কখন ছাড়াইয়া গেল তারাপদ তাহার খোঁজ লইল না। অত্যন্ত মৃদুমন্দ গতিতে বৃহৎ নৌকাখানা কখনও পাল তুলিয়া কখনও গুন টানিয়া নানা নদীর শাখা প্রশাখার ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল; নৌকারোহীদের দিনগুলিও এই সকল নদী উপনদীর মতো শান্তিময় সৌন্দর্যময় বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সহজ সৌম্য গমনে মৃদুমিষ্ট কলস্বরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাহারও কোনরূপ তাড়া ছিল না, মধ্যাহ্নে স্নানাহারে অনেকক্ষণ বিলম্ব হইত, এ দিকে সন্ধ্যা হইতে না হইতে একটা বড়ো দেখিয়া গ্রামের ধারে, ঘাটের কাছে, ঝিল্লিমন্দ্রিত খদ্যোৎখচিত বনের পার্শ্বে নৌকা বাঁধিত।

এমনি করিয়া দিনদশেকে নৌকা কাঁঠালিয়ায় পৌঁছিল। জমিদারের আগমনে বাড়ি হইতে পালকি এবং টাট্টু ঘোড়ার সমাগম হইল এবং বাঁশের লাঠি হস্তে পাইক বরকন্দাজের দল ঘন ঘন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে গ্রামের উৎকণ্ঠিত কাকসমাজকে যৎপরনাস্তি মুখর করিয়া তুলিল।

এই সমস্ত সমারোহ কালবিলম্ব হইতেছে, ইতিমধ্যে তারাপদ নৌকা হইতে দ্রুত নামিয়া একবার সমস্ত গ্রাম পর্যটন করিয়া লইল। কাহাকেও দাদা, কাহাকেও খুড়া, কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসি বলিয়া দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামের সহিত সৌহার্দ্য-বন্ধন স্থাপিত করিয়া লইল। কোথাও তাহার প্রকৃত কোন বন্ধন ছিল না বলিয়াই এই বালক আশ্চর্য সত্বর ও সহজে সকলেরই সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারিত। তারাপদ দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইল।

এত সহজে হৃদয় হরণ করিবার কারণ এই তারাপদ সকলেরই সঙ্গে তাহাদের নিজের মত হইয়া স্বভাবতই যোগ দিতে পারিত। সে কোন প্রকার বিশেষ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না, অথচ সকল অবস্থা সকল কাজের প্রতিই তাহার একপ্রকার সহজ প্রবণতা ছিল।

বালকের কাছে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বালক অথচ তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র বৃদ্ধের কাছে সে বালক নহে। অথচ জ্যাঠাও নহে, রাখালের সঙ্গে সে রাখাল অথচ ব্রাহ্মণ। সকলের সকল কাজেই সে চিরকালের সহযোগীর ন্যায় অভ্যস্তভাবে হস্তক্ষেপ করে; ময়রার দোকানে গল্প করিতে করিতে ময়রা বলে, "দাদাঠাকুর একটু বসো তো ভাই, আমি আসছি"—তারাপদ অম্লানবদনে দোকানে বসিয়া একখানা শালপাতা লইয়া সন্দেশের মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়। ভিয়ান করিতেও সে মজবুত, তাঁতের রহস্যও তাহার কিছু কিছু জানা আছে, কুমারের চক্রচালনও তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে।

তারাপদ সমস্ত গ্রামটি আয়ত্ত করিয়া লইল, কেবল গ্রামবাসিনী একটি বালিকার ঈর্ষা সে এখনও জয় করিতে পারিলনা। এই বালিকাটি তারাপদর সুদূরে নির্বাসন তীব্রভাবে কামনা করিতেছে জানিয়াই বোধ করি তারাপদ এই গ্রামে এতদিন আবদ্ধ হইয়া রহিল।

কিন্তু বালিকাবস্থাতেও নারীদের অন্তররহস্য ভেদকরা সুকঠিন, চারুশশী তাহার প্রমাণ দিল।

বামুনঠাকরুনের মেয়ে সোনামণি পাঁচ বছর বয়সে বিধবা হয়; সে-ই চারুর সমবয়সী সখী। তাহার শরীর অসুস্থ থাকাতে গৃহপ্রত্যাগত সখীর সহিত সে কিছুদিন সাক্ষাত করিতে পারে নাই। সুস্থ হইয়া যেদিন দেখা করিতে আসিল সেদিন প্রায় বিনা কারণেই দুই সখীর মধ্যে একটু মনোবিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইল।

চারু অত্যন্ত ফাঁদিয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, তারাপদ-নামক তাহাদের নবার্জিত পরমরত্নটির আহরণকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া সে তাহার সখীর কৌতূহল এবং বিস্ময় সপ্তমে চড়াইয়া দিবে। কিন্তু যখন সে শুনিল, তারাপদ সোনামণির নিকট কিছুমাত্র অপরিচিত নহে, বামনঠাকরুনকে সে মাসি বলে এবং সোনামণি তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকে, যখন শুনিল তারাপদ কেবল যে বাঁশিতে কীর্তনের সুর বাজাইয়া মাতা ও কন্যার মনোরঞ্জন করিয়াছে তাহা নহে, সোনামণির অনুরোধে তাহাকে স্বহস্তে একটি বাঁশের বাঁশি

বানাইয়া দিয়াছে, তাহাকে কতদিন উচ্চশাখা হইতে ফল ও কণ্টক শাখা হইতে ফুল পাড়িয়া দিয়াছে। তখন চারুর অন্তঃকরণে যেন তপ্তশেল বিঁধিতে লাগিল। চারু জানিত, তারাপদ বিশেষরূপে তাহাদেরই তারাপদ—অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষণীয় ইতরসাধারণে তাহার একটু আধটু আভাসমাত্র পাইবে অথচ কোনমতে নাগাল পাইবে না, দূর হইতে তাহার রূপে গুনে মুগ্ধ হইবে এবং চারুশশীদের ধন্যবাদ দিতে থাকিবে। এই আশ্চর্য দুর্লভ দৈবলব্ধ ব্রাহ্মণ বালকটি সোনামণির কাছে কেন সহজগম্য হইল। আমরা যদি এত যত্ন করিয়া না আনিতাম, এত যত্ন করিয়া না রাখিতাম, তাহা হইলে সোনামণিরা তাহার দর্শন পাইত কোথা হইতে। সোনামণির দাদা! শুনিয়া সর্বশরীর জ্বলিয়া যায়।

যে তারাপদকে চারু মনে মনে বিদ্বেষশরে জর্জর করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহারই একাধিকার লইয়া এমন প্রবল উদ্বেগ কেন। বুঝিবে কাহার সাধ্য।

সেইদিনই অপর একটি তুচ্ছ সূত্রে সোনামণির সহিত চারুর মর্মান্তিক আড়ি হইয়া গেল। এবং সে তারাপদর ঘরে গিয়া তাহার সখের বাঁশিটি বাহির করিয়া তাহার উপর লাফাইয়া মাড়াইয়া সেটাকে নির্দয়ভাবে ভাঙিতে লাগিল।

চারু যখন প্রচণ্ড আবেগে এই বংশিধ্বংসকার্যে নিযুক্ত আছে এমন সময় তারাপদ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে বালিকার এই প্রলয় মূর্তি দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। কহিল, "চারু আমার বাঁশিটা ভাঙছ কেন।" চারু রক্তনেত্রে রক্তিমমুখে "বেশ করছি, খুব করছি" বলিয়া আরও বার দুই-চার বিদীর্ণ বাঁশির উপর অনাবশ্যক পদাঘাত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারাপদ বাঁশিটি তুলিয়া উলটিয়া পালটিয়া দেখিল, তাহাতে আর পদার্থ নাই। অকারণে তাহার পুরাতন নিরপরাধ বাঁশিটার এই আকস্মিক দুর্গতি দেখিয়া সে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। চারুশশী প্রতিদিন তাহার পক্ষে পরম কৌতূহলের বিষয় হইয়া উঠিল।

তাহার আর একটি কৌতূহলের ক্ষেত্র ছিল মতিলালবাবুর লাইব্রেরিতে ইংরাজি ছবির বইগুলি। বাহিরের সংসারের সহিত তাহার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে। কিন্তু এই ছবির জগতে সে কিছুতেই ভাল করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। কল্পনার দ্বারা আপনার মনে অনেকটা পূরণ করিয়া লইত কিন্তু তাহাতে মন কিছুতেই তৃপ্তি মানিত না।

ছবির বহির প্রতি তারাপদর এই আগ্রহ দেখিয়া একদিন মতিলালবাবু বলিলেন "ইংরিজি শিখবে? তা হলে এ সমস্ত ছবির মানে বুঝতে পারবে।" তারাপদ তৎক্ষণাৎ বলিল, "শিখব।"

মতিবাবু খুব খুশি হইয়া গ্রামের এনট্রান্স স্কুলের হেডমাস্টার রামরতনবাবুকে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই বালকের ইংরাজি-অধ্যাপন-কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

তারাপদ তাহার প্রখর স্মরণশক্তি এবং অখণ্ড মনোযোগ লইয়া ইংরাজি শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। সে যেন এক নূতন দুর্গম রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইল, পুরাতন সংসারের সহিত কোনো সম্পর্ক রাখিল না, পাড়ার লোকেরা আর তাহাকে দেখিতে পাইল না; যখন সে সন্ধ্যার পূর্বে নির্জন নদীতীরে দ্রুতবেগে পদচারণ করিতে করিতে পড়া মুখস্ত করিত তখন তাহার উপাসক বালকসম্প্রদায় দূর হইতে ক্ষুন্নচিত্তে সসম্ভ্রমে তাহাকে নিরীক্ষণ করিত, তাহার পাঠে ব্যাঘাত করিতে সাহস করিত না।

চারুও তাহাকে আজকাল বড়ো একটা দেখিতে পাইত না। পূর্বে তারাপদ অন্তঃপুরে গিয়া অন্নপূর্ণার স্নেহদৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া আহার করিত—কিন্তু তদুপলক্ষে প্রায় মাঝে মাঝে কিছু বিলম্ব হইয়া যাইত বলিয়া সে মতিবাবুকে অনুরোধ করিয়া বাহিরে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহাতে অন্নপূর্ণা ব্যথিত হইয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মতিবাবু বালকের অধ্যয়নের উৎসাহে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই নূতন ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন।

এমন সময় চারুও হঠাৎ জিদ ধরিয়া বসিল, "আমিও ইংরাজি শিখিব।" তাহার পিতামাতা তাঁহাদের খামখেয়ালি কন্যার এই প্রস্তাবটিকে প্রথমে পরিহাসের বিষয় জ্ঞান করিয়া স্নেহমিশ্রিত হাস্য করিলেন—কিন্তু কন্যাটির এই প্রস্তাবের পরিহাস্য অংশটুকুকে প্রচুর অশ্রুজলধারায় অতি শীঘ্রই নিঃশেষে ধৌত করিয়া ফেলিয়াছিল। অবশেষে এই স্নেহদুর্বল নিরুপায় অভিভাবকদ্বয় বালিকার প্রস্তাব গম্ভীরভাবে গ্রাহ্য করিলেন। চারু মাস্টারের নিকট তারাপদর সহিত একত্রে অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু পড়াশুনা করা এই অস্থিরচিত্ত বালিকার স্বভাবসংগত ছিল না। সে নিজে কিছু শিখিল না, কেবল তারাপদর অধ্যয়নে ব্যাঘাত করিতে লাগিল। সে পিছাইয়া পড়ে, পড়া মুখস্থ করে না, কিন্তু তবু কিছুতেই তারাপদর পশ্চাদ্বর্তী হইয়া থাকিতে চাহে না। তারাপদ তাহাকে অতিক্রম করিয়া নূতন পড়া লইতে গেলে সে মহা রাগারাগি করিত, এমন কি কান্নাকাটি করিতে ছাড়িত না। তারাপদ পুরাতন বই শেষ করিয়া নূতন বই কিনিলে তাহাকেও সেই নূতন বই কিনিয়া দিতে হইত। তারাপদ অবসরের সময় নিজে ঘরে বসিয়া লিখিত এবং পড়া মুখস্ত করিত, ইহা সেই ঈর্ষাপরায়ণা কন্যাটির সহ্য হইত না, সে গোপনে তাহার লেখা খাতায় কালি ঢালিয়া আসিত, কলম চুরি করিয়া রাখিত, এমন কি বইয়ের যেখানে অভ্যাস করিবার, সেই অংশটি ছিঁড়িয়া আসিত। তারাপদ এই বালিকার অনেক দৌরাত্ম্য সকৌতুকে সহ্য করিত, অসহ্য হইলে মারিত। কিন্তু কিছুতেই

শাসন করিতে পারিত না।

দৈবাৎ একটা উপায় বাহির হইল। একদিন বড়ো বিরক্ত হইয়া নিরুপায় তারাপদ তাহার মসীবিলুপ্ত লেখা খাতা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া গম্ভীর বিষন্ন মুখে বসিয়া ছিল ; চারু দ্বারের কাছে আসিয়া মনে করিল, আজ মার খাইবে। কিন্তু তাহার প্রত্যাশা পূর্ণ হইল না। তারাপদ একটি কথামাত্র না কহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকা ঘরের ভিতরে বাহিরে ঘুরঘুর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বারম্বার এত কাছে ধরা দিল যে, তারাপদ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত বসাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে তাহা না দিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বালিকা মহা মুশকিলে পড়িল। কেমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় সে বিদ্যা তাহার কোনকালেই অভ্যাস ছিল না। অথচ অনুতপ্ত ক্ষুদ্র হৃদয়টি তাহার সহপাঠীর ক্ষমালাভের জন্য একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অবশেষে কোন উপায় না দেখিয়া ছিন্ন খাতার এক টুকরা লইয়া তারাপদর নিকটে বসিয়া খুব বড় বড় করিয়া লিখিল, "আমি আর কখনও খাতায় কালি মাখাব না।" লেখা শেষ করিয়া সেই লেখার প্রতি তারাপদর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অনেকপ্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিয়া তারাপদ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না—হাসিয়া উঠিল। তখন বালিকা লজ্জায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া ঘর হইতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যে কাগজের টুকরায় সে স্বহস্তে দীনতা প্রকাশ করিয়াছে সেটা অনন্তকাল এবং অনন্ত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ লোপ করিতে পারিলে তবে তাহার হৃদয়ের নিদারুণ ক্ষোভ মিটিতে পারিত।

এদিকে সংকুচিতচিত্তে সোনামণি দু-একদিন অধ্যয়ন-শালার বাহিরে উঁকিঝুঁকি মারিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। সখী চারুশশীর সহিত তাহার সকল বিষয়েই বিশেষই হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু তারাপদর সম্বন্ধে চারুকে সে অত্যন্ত ভয় এবং সন্দেহের সহিত দেখিত। চারু যে সময়ে অন্তঃপুরে থাকিত সেই সময়টি বাছিয়া সোনামণি সসংকোচে

তারাপদর দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। তারাপদ বই হইতে মুখ তুলিয়া সস্নেহে বলিত, "কী সোনা খবর কী, মাসি কেমন আছে ?"

সোনামণি কহিত, "অনেকদিন যাও নি, মা তোমাকে একবার যেতে বলেছে। মার কোমরে ব্যথা বলে দেখতে আসতে পারে না।"

এমন সময় হয়ত চারু আসিয়া উপস্থিত। সোনামণি শশব্যস্ত। সে যেন গোপনে তাহার সখীর সম্পত্তি চুরি করিতে আসিয়াছিল। চারু কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিত, "অ্যাঁ সোনা! তুই পড়ার সময় গোল করতে এসেছিস, আমি এখনই বাবাকে গিয়ে বলে দেব।" যেন তিনি নিজে তারাপদর একটি প্রবীনা অভিভাবিকা; তাহার পড়াশুনায় লেশমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে রাত্রিদিন ইহার প্রতিই তাহার একমাত্র দৃষ্টি। কিন্তু সে নিজে কি অভিপ্রায়ে এই অসময়ে তারাপদর পাঠগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না এবং তারাপদও তাহা ভালরূপে জানিত। কিন্তু সোনামণি বেচারা ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ একরাশ মিথ্যা কৈফিয়ত সৃজন করিত; অবশেষে চারু যখন ঘৃনাভরে তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সম্ভাষণ করিত তখন সে লজ্জিত শঙ্কিত পরাজিত হইয়া ব্যথিতচিত্তে ফিরিয়া যাইত। দয়ার্দ্র তারাপদ তাহাকে ডাকিয়া বলিত, "সোনা আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি তোদের বাড়ি যাব এখন।" চারু সর্পিণীর মতো ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিত, "যাবে বৈকি। তোমার পড়া করতে হবে না? আমি মাস্টার-মশায়কে বলে দেব না?"

চারুর এই শাসনে ভীত না হইয়া তারাপদ দু একদিন সন্ধ্যার পর বামুনঠাকরুনের বাড়ি গিয়াছিল। তৃতীয় বা চতুর্থ বারে চারু ফাঁকা শাসন না করিয়া আস্তে আস্তে এক সময় বাহির হইতে তারাপদর ঘরের দ্বারে শিকল আঁটিয়া দিয়া মার মসলার বাক্সের চাবিতালা আনিয়া তালা লাগাইয়া দিল। সমস্ত সন্ধ্যাবেলা তারাপদকে এইরূপ বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আহারের সময় দ্বার খুলিয়া দিল। তারাপদ রাগ করিয়া কথা কহিল না এবং না খাইয়া চলিয়া

যাইবার উপক্রম করিল। তখন অনুতপ্ত ব্যাকুল বালিকা করজোড়ে সানুনয়ে বারম্বার বলিতে লাগিল, "তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আর আমি একদম করব না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি তুমি খেয়ে যাও।" তাহাতেও যখন তারাপদ বশ মানিল না, তখন সে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল, তারাপদ সংকটে পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিল।

চারু কতবার একান্তমনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে তারাপদর সহিত সদব্যবহার করিবে, আর কখনও তাহাকে মুহূর্তের জন্য বিরক্ত করিবে না, কিন্তু সোনামণি প্রভৃতি আর পাঁচজন মাঝে আসিয়া পড়াতে কখন তাহার কিরূপ মেজাজ হইয়া যায় কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। কিছুদিন যখন উপরি-উপরি সে ভাল মানুষি করিতে থাকে তখনই একটা উৎকট আসন্ন বিপ্লবের জন্য তারাপদ সতর্কভাবে প্রস্তুত হইতে থাকে। আক্রমণটা হঠাৎ কী উপলক্ষে কোন্‌দিক হইতে আসে কিছুই বলা যায় না। তাহার পরে প্রচণ্ড ঝড়, ঝড়ের পরে প্রচুরঅশ্রুবারিবর্ষণ তাহার পরে প্রসন্ন স্নিগ্ধ শান্তি।

॥ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ॥

এমন করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাটিল। এত সুদীর্ঘ কালের জন্য তারাপদ কখনও কাহারও নিকট ধরা দেয় নাই। বোধ করি পড়াশুনার মধ্যে তাহার মন এক অপূর্ব আকর্ষণে বদ্ধ হইয়াছিল; বোধ করি, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং স্থায়ী হইয়া বসিয়া সংসারের সুখস্বচ্ছন্দতা ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল; বোধ করি তাহার সহপাঠিকা বালিকার নিয়তদৌরাত্ম্যচঞ্চল সৌন্দর্য অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিতেছিল।

এদিকে চারুর বয়স এগারো উত্তীর্ণ হইয়া যায়। মতিবাবু সন্ধান করিয়া তাঁহার মেয়ের বিবাহের জন্য দুই তিনটি ভাল ভাল সম্বন্ধ আনাইলেন। কন্যার বিবাহ বয়স উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া মতিবাবু তাহার ইংরাজি পড়া এবং বাহিরে যাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। এই আকস্মিক অবরোধে চারু ঘরের মধ্যে ভারি একটা আন্দোলন উপস্থিত করিল।

তখন একদিন অন্নপূর্ণা মতিবাবুকে ডাকিয়া কহিলেন, "পাত্রের জন্য তুমি এত খোঁজ করে বেড়াচ্ছ কেন। তারাপদ ছেলেটি তো বেশ। আর তোমার মেয়েরও ওকে পছন্দ হয়েছে।"

শুনিয়া মতিবাবু অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "সেও কি কখনও হয়। তারাপদর কুলশীল কিছুই জানা নেই। আমার একটিমাত্র মেয়ে আমি ভাল ঘরে দিতে চাই।"

একদিন রায়ডাঙার বাবুদের বাড়ি হইতে মেয়ে দেখিতে আসিল। চারুকে বেশভূষা পরাইয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হইল। সে শোবার ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল – কিছুতেই বাহির হইল না। মতিবাবু ঘরের বাহির হইতে অনেক অনুনয় করিলেন, ভর্ৎসনা করিলেন কিছুতেই কিছু ফল হইল না। অবশেষে বাহিরে আসিয়া রায়ডাঙার দূতবর্গের নিকট মিথ্যা করিয়া বলিতে হইল, কন্যার হঠাৎ অত্যন্ত অসুখ করিয়াছে, আজ আর দেখানো হইবে না। তাহারা ভাবিল মেয়ের বুঝি কোন একটা দোষ আছে, তাই এইরূপ চাতুরী অবলম্বন করা হইল।

তখন মতিবাবু ভাবিতে লাগিলেন, তারাপদ ছেলেটি দেখিতে শুনিতে সকল হিসাবেই ভালো উহাকে আমি ঘরেই রাখিতে পারিব, তাহা হইলে আমার একমাত্র মেয়েটিকে পরের বাড়ি পাঠাইতে হইবে না। ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অশান্ত অবাধ্য মেয়েটির দুরন্তপনা তাঁহাদের স্নেহের চক্ষে যতই মার্জনীয় বোধ হউক শ্বশুর-বাড়ীতে কেহ সহ্য করিবে না।

তখন স্ত্রী পুরুষে অনেক আলোচনা করিয়া তারাপদর দেশে তাহার

আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল। গ্রামের নদী এতদিন শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল, মাঝে মাঝে কেবল এক-একটা ডোবায় জল বাধিয়া থাকিত। ছোট ছোট নৌকা সেই পঙ্কিল জলে ডোবানো ছিল এবং শুষ্ক নদীপথে গোরুর গাড়ি-চলাচলের সুগভীর চক্রচিহ্ন ক্ষোদিত হইতেছিল—এমন সময় একদিন পিতৃগৃহ-প্রত্যাগত পার্বতীর মতো, কোথা হইতে দ্রুতগামিনী জলধারা কলহাস্য-সহকারে গ্রামের শূন্যবক্ষে আসিয়া সমাগত হইল—উলঙ্গ বালকবালিকারা তীরে আসিয়া উচ্চৈস্বরে নৃত্য করিতে লাগিল, অতৃপ্ত আনন্দে বারম্বার জলে ঝাঁপ দিয়া দিয়া নদীকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে লাগিল, কুটির-বাসিনীরা তাহাদের পরিচিত প্রিয়সঙ্গিনীকে দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল—শুষ্ক নির্জীব গ্রামের মধ্যে কোথা হইতে এত প্রবল বিপুল প্রাণহিল্লোল আসিয়া প্রবেশ করিল। দেশবিদেশ হইতে বোঝাই হইয়া ছোট বড়ো আয়তনের নৌকা আসিতে লাগিল—বাজারের ঘাট সন্ধ্যাবেলায় বিদেশী মাঝির সংগীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুই তীরের গ্রামগুলি সম্বৎসর আপনার নিভৃত কোণে আপনার ক্ষুদ্র ঘরকন্না লইয়া একাকিনী দিনযাপন করিতে থাকে। বর্ষার সময় বাহিরের বৃহৎ পৃথিবী বিচিত্র পণ্যোপহার লইয়া গৈরিকবর্ণ জলরথে চড়িয়া এই গ্রাম কন্যাগুলির তত্ত্ব লইতে আসে; তখন জগতের সঙ্গে আত্মীয়তাগর্বে কিছুদিনের জন্য তাহাদের ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া যায়, সমস্তই সচল সজাগ সজীব হইয়া ওঠে এবং মৌন নিস্তব্ধ দেশের মধ্যে সুদূর রাজ্যের কলালাপধ্বনি আসিয়া চারিদিকের আকাশকে আন্দোলিত করিয়া তুলে।

এই সময়ে কুড়ুল কাটায় নাগবাবুদের এলাকায় বিখ্যাত রথযাত্রার মেলা হইবে। জ্যোৎস্না-সন্ধ্যায় তারাপদ ঘাটে গিয়া দেখিল, কোন নৌকা নাগরদোলা, কোন নৌকা যাত্রার দল, কোন নৌকা পণ্যদ্রব্য লইয়া প্রবল নবীন স্রোতের মুখে দ্রুতবেগে মেলাভিমুখে চলিয়াছে; কলিকাতার কন্‌সর্টের দল বিপুল শব্দে দ্রুততালের বাজনা জুড়িয়া দিয়াছে। যাত্রার দল বেহালার সঙ্গে গান গাহিতেছে

সমস্ত কৌলিক সংবাদ সন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। খবর আসিল যে বংশ ভালো কিন্তু দরিদ্র। তখন মতিবাবু ছেলের মা এবং ভাইয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইলেন। তাঁহারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সম্মতি দিতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কাঁঠালিয়ায় মতিবাবু এবং অন্নপূর্ণা বিবাহের দিনক্ষণ আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক গোপনতাপ্রিয় সাবধানী মতিবাবু কথাটা গোপনে রাখিলেন।

চারুকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে মাঝে মাঝে বর্গির হাঙ্গামার মতো তারাপদর পাঠগৃহে গিয়া পড়িত। কখনও রাগ, কখনও অনুরাগ, কখনও বিরাগের দ্বারা তাহার পাঠচর্যার নিভৃত শান্তি অকস্মাৎ তরঙ্গিত করিয়া তুলিত। তাহাতে আজকাল এই নির্লিপ্ত মুক্তস্বভাব ব্রাহ্মণ বালকের চিত্তে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎস্পন্দনের ন্যায় এক অপূর্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার হইত। যে ব্যক্তির লঘুভার চিত্ত চিরকাল অক্ষুণ্ণ অব্যাহতভাবে কলস্রোতের তরঙ্গচূড়ায় ভাসমান হইয়া সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত, সে আজকাল এক-একবার অন্যমনস্ক হইয়া বিচিত্র দিবাস্বপ্নজালের মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। এক-একদিন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া সে মতিবাবুর লাইব্রেরির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছবির বইয়ের পাতা উল্টাইতে থাকিত; সেই ছবিগুলির মিশ্রণে যে কল্পনালোক সৃজিত হইত তাহা পূর্বেকার হইতে অনেক স্বতন্ত্র এবং অধিকতর রঙিণ। চারুর অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিয়া সে আর পূর্বের মতো স্বভাবতঃ পরিহাস করিতে পারিত না, দুষ্টামি করিলে তাহাকে মারিবার কথা মনেও উদয় হইত না। নিজের এই গূঢ় পরিবর্তন, এই আবদ্ধ আসক্ত ভাব তাহার নিজের কাছে এক নূতন স্বপ্নের মতো মনে হইতে লাগিল।

শ্রাবণ মাসে বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া মতিবাবু তারাপদর মা ও ভাইদের আনিতে পাঠাইলেন, তারাপদকে তাহা জানিতে দিলেন না। কলিকাতার মোক্তারকে গড়ের বাদ্য বায়না দিতে আদেশ করিলেন এবং জিনিসপত্রের ফর্দ পাঠাইয়া দিলেন।

এবং সমের কাছে হাহাহাঃ শব্দে চিৎকার উঠিতেছে, পশ্চিমদেশী নৌকার দাড়িমাল্লাগুলো কেবলমাত্র মাদল এবং করতাল লইয়া উন্মত্ত উৎসাহে বিনা সংগীতে খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে—উদ্দীপনার সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে পূর্ব-দিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল—পুবে বাতাস বেগে বহিতে লাগিল। মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খলখল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদীতীরবর্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল। সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা—চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে ; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে, দেখিতে দেখিতে গুরুগুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর এক তীরে এক পার্শ্বে কাঁঠালিয়া গ্রাম আপন কুঠিরদ্বার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

পরদিন তারাপদর মাতা ও ভ্রাতাগণ কাঁঠালিয়ায় আসিয়া অবতরণ করিলেন, পরদিন কলিকাতা হইতে বিবিধসামগ্রীপূর্ণ তিনখানা বড়ো নৌকা আসিয়া কাঁঠালিয়ার জমিদারী কাছারির ঘাটে লাগিল এবং পরদিন অতি প্রাতে সোনামণি কাগজে কিঞ্চিৎ আমসত্ত্ব এবং পাতার ঠোঙায় কিঞ্চিৎ আচার লইয়া ভয়ে ভয়ে তারাপদর পাঠগৃহদ্বারে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল—কিন্তু পরদিন তারাপদকে দেখা গেল না। স্নেহ-প্রেম-বন্ধুত্বে ষড়যন্ত্রবন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।

ভাদ্র-কার্ত্তিক—১৩০২



সাহিত্যিক গোপাল হালদার: যাঁকে
বাংলা উপন্যাসের বিশেষ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা
হিসাবেই বলা যায়। গোপাল হালদারের
প্রবন্ধ থেকে উপন্যাস বিষয়ে শ্রেষ্ঠ
সাহিত্যিকদের সাথে পরিচিত হওয়া
সাধারণ পাঠকের সম্ভব হয়েছে। তবু আজ
যাঁদের লেখা বিশেষ ভাবে অন্তরের সুযোগ
হবে, বিশেষ করে তাঁদের সৃষ্টি প্রতিভার
প্রমাণ যা পাওয়া যায় সেই উদাহরণ দিয়ে
শ্রী প্রবীর সেন ও বহুল আহমদ তাদের
সাহিত্য-রস-বোধ ও অনুভবের ক্ষমতা দিয়ে
যে সংক্ষিপ্ত সংকলনটি প্রস্তুত করেছেন সমকালের
হিসাবে তা শুধু পাঠক-মনের সাহিত্য-তৃপ্তি লাভ করেছে।
লেখক-জীবনী ও বিষয়-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ-
নিদর্শনের সঙ্গে পরিচিত হবার যে সুযোগ দেওয়া
দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে আমাদের নিকট সৌভাগ্য বলেই
মনে করা উচিত।